চতুর্থ অধ্যায়ে তথা চতুর্থ বক্তৃতায় আবদুল ওদুদ বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে উনিশ শতকের শেষে কংগ্রেস স্থাপন—এই সময়পর্বে বাংলার মুসলমানদের চিন্তাজগৎ ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং তাদের মধ্যে হিন্দু নব জাগরণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দিয়েছেন।

হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই বাংলার নব জাগরণকে হিন্দু ব্যাপার বলে মনে করা হয়। কারণ রামমোহন শুরু করেছিলেন প্রচলিত হিন্দু ধর্মের ব্যাপ্ত সংস্কার এবং ইংরেজি শিক্ষা আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বীকরণে হিন্দুদের ছিল প্রবল আগ্রহ।

শাসনকালের সূচনায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ইংরেজরা করেনি। কারণ পলাশীর যুদ্ধ জয়ের ফলে তারা কেবলমাত্র বাংলার দেওয়ানি অর্থাৎ দিল্লি-সম্রাটের পক্ষে খাজনা আদায়ের অধিকার পেয়েছিল। শাসন কার্যের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন হয়নি। মুসলমানগণ বিচার ও হিন্দুগণ রাজস্ব বিভাগে আগের মতোই কাজ করছিল। নিজেদের শাসনক্ষমতা বিলুপ্তি বিষয়ে মুসলমানগণ তেমন সচেতন ছিল না। তার প্রমাণ ১৭৮০-তে মুসলমানদের অনুরোধে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন—যার উদ্দেশ্য ছিল কাজি মুফতি পদের যোগ্য কর্মী পাওয়া।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থায় বড়ো পরিবর্তন এল ১৭৬৯-এর মন্বন্তরের পর। মন্বন্তর হেতু খাজনা আদায়ের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গৃহীত নতুন কিছু ব্যবস্থা তার কারণ। এ সম্বন্ধে ডবলু. ডবলু. হান্টার (Sir William Wilson Hunter : ১৮৪০-১৯০০) বলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ ও স্যর জন শোর প্রবর্তিত সংস্কার-পরম্পরার পরিণতি ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর ফলে শাসক ও প্রজার কাছ থেকে কর আদায়কারী মধ্যস্থ শ্রেণির উচ্চ কর্মচারীরা হলেন ইংরেজ। ঢাল-ঘোড়সওয়ারধারী মুসলমান তহশিলদারের পরিবর্তে এলেন ইংরেজ কালেক্টর ও তাঁর আদালতের সঙ্গে যুক্ত বন্দী ও নিলাম করার ক্ষমতাযুক্ত নিরস্ত্র আমলা ও বরকন্দাজ। উচ্চ শ্রেণির মুসলমানরা হলেন কেবল জমিদার—ভূমিজ লভ্যের প্রাপ্য অংশ থেকে তাঁর বঞ্চিত হলেন। এই পরিবর্তনের ফল দেখা গেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এর ফলে প্রজার নিকট থেকে সরাসরি খাজনা আদায়ের ভার পেলেন জমিদারগণ। মধ্যস্বত্বভোগীদের কথা থাকলেও ১৭৯৩-এর ব্যবস্থায় ভূমিকর-আদায়কারী কর্মচারীদের দৃষ্টি ছিল কেবল সরকার, প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায়কারী স্থানীয় আমলা বা জমিদার এবং জমিচাষকারী কৃষকগণের উপর। এ ছাড়া মুসলিম আমলের অন্যান্য ব্যবস্থা লুপ্ত হয়েছিল। এর ফল সমৃদ্ধ মুসলমানদের পক্ষে হয় মারাত্মক। কারণ তালুকদারগণ তালুকের অংশ পত্তনি দিলেও পত্তনিদারদের উপর তাঁর অধিকার বজায় থাকত। দরকার মতো তিনি এঁদের কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে সেস বা চাঁদা আদায় করতে পারতেন। মি. জেমস ও'কিনিলি সি. এস. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন, এর ফলে সামান্য পদাধিকারী হিন্দুরা হলেন জমিদার; মুসলিম আমলে যে অর্থ পেতেন মুসলমানগণ, তা পেতে থাকলেন হিন্দুরা।

এরপর হল রিজাম্পসন প্রসিডিংস (Resumption Proceedings)-এর প্রচলন। তার ফল মুসলমানদের পক্ষে হল আরও মারাত্মক। এ বিষয়ে হান্টার লিখছেন ইংরেজ বাংলার শাসক হয়ে দেখল দেশের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ জমি নিষ্করভোগীদের দখলে। ১৭৭২-এ ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings : ১৭৩২-১৮১৮) তা বুঝলেও জনমতের প্রবল বিরোধিতায় এসব জমি তিনি বাজেয়াপ্ত করতে পারেননি। ১৯৯৭-এ লর্ড কর্নওয়ালিশ ঘোষণা করেন ইংরেজ সরকারের অনুমোদিত নিষ্করসমূহে তাঁদেরই অধিকার। কিন্তু এ নীতি কার্যকর করার সাহস তাঁদের হল না। ১৮১৯-এ আবার নীতিটি ঘোষিত হলেও কাজ কিছু হয় না। ১৮২৮-এ ব্যবস্থাপক বিভাগ ও শাসক বিভাগ নিষ্করভোগীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য স্থাপন করলেন বিশেষ আদালত, প্রণীত হল 'তিন' আইন। এ

আইন বলে রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীরা আদালতের রায় ব্যতীত নিজ বিবেচনায় নিষ্করভোগীদের অধিকার নাকচ করতে পারবেন। এর আগে নিয়ম ছিল রাজস্বের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভিযোগে আদালতের বিচারে অবৈধ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নিষ্করভোগীগণ ভূমি ভোগ করতে পারবে। তা এই তিন আইনে বাতিল হল। এভাবে নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করে (আট লক্ষ পাউন্ড ব্যয়ে) বার্ষিক তিন লক্ষ পাউন্ড আয়ের স্থায়ী সম্পত্তি সরকার পেলেন। বাজেয়াপ্ত জমির অধিকাংশ ছিল মুসলিম পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের। ফলে শত শত প্রাচীন পরিবার ও মুসলিম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হল। মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেখা দিল ভীতি ও বিতৃষ্ণা যা সহজে নষ্ট হয়নি। রামমোহন রায় ভারতে ও ইংল্যান্ড-এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন।

১৮৩৬-এ রাজকর্মের ভাষা পারসির বদলে হল ইংরেজি। ফলে অধিকাংশ সরকারি পদ অধিকার করে হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণ দল। দীর্ঘ কাল কোনো মুসলমান রাজপদ পাননি। মাইকেল মধুসূদনের দুই মুসলমান বন্ধুর একজন আবদুল লতিফ (পরে নবাব) ১৮৪৯-এ ডেপুটি ম্যাজিস্টেট হন। ১৮৮৫ খিস্টাব্দে লেখা 'আত্মচরিত'-এ তিনি লিখেছেন গত ছত্রিশ বছরে সব ব্যাপারে মুসলমানদের মুখপাত্র ছিলেন তিনি একা। এ থেকে ইংরেজ শাসনের সূচনা ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা—এই দীর্ঘ সময়ে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের বিরূপতার পরিমাণ বোঝা যায়। এই সময়ের মধ্যে মাত্র দুটি মুসলিম পরিচালিত সংবাদপত্রের সন্ধান মেলে—(১) 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (১৮৪৬ : ইংরেজি, পারসি) উর্দু ও বাংলা—এই চার ভাষায় মুদ্রিত হত এবং 'ফরিদপুর দর্পণ' (১৮৬১)।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের আগ্রহ ও মুসলমানদের অনাগ্রহের ছিল নানা কারণ—(১) উচ্চ শ্রেণির মুসলমানগণ ছিলেন জমিদার ও রাজকর্মচারী আর সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের কয়েকজন জমিদার হলেও বেশির ভাগ ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে ইংরেজ-সংস্পর্শের কারণে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের মনে আগ্রহ জাগে। মুসলমানদের এরূপ কোনো তাগিদ ছিল না।

(২) ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে মুসলমানদের প্রতিপত্তি অধিক হলেও সাধারণ মানুষ ছিল হিন্দু। ইংরেজগণ এদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়।

(৩) আচারে অনুদার হিন্দুরা ছিল পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ।

আচার উদার হলেও ধর্মবিষয়ে মুসলমানগণ ছিল গোঁড়া। বিধর্মীর ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাই তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না।

(৪) হিন্দুরা এতদিন রাজভাষা পারসি শিখে এসেছে, তাই অন্য একটি সরকারি ভাষা শিখতে তাদের অসুবিধে হয়নি।

স্ব-প্রাধান্য-সচেতন মুসলিম গোষ্ঠী বিজাতীয় ভাষা সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ অনুভব করেনি।

দীর্ঘকাল চলেছিল এ অবস্থা। অবক্ষয়ের চরমে পৌঁছে রাজ্য হারালেও আপন হীনাবস্থা সম্বন্ধে মুসলিমগণ ছিল অসচেতন। এই অবস্থার নিখুঁত চিত্র আছে সৈয়দ গোলাম হোসেনের 'সিয়ারুল মোতা আখেরুন' গ্রন্থে। কয়েকজন গুণী ব্যক্তি তখনও মুসলমান সমাজে ছিলেন। ইংল্যান্ড-এ সাক্ষ্যদান কালে রামমোহন রায় উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মচারীদের বিদ্যা ও চরিত্রের প্রশংসা করেন। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে ছিল নিজেদের হীনতা সম্বন্ধে উদাসীনতা ও ব্যাপক কদাচার। তাই বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের সরিয়ে তাদের স্থান দখল করছিল নানা ইউরোপীয় জাতি।

এ অবস্থার ঈষৎ পরিবর্তন দেখা দেয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আরবে ওহাবি আন্দোলনের ফলে। নামটির

উৎস অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের আরব বীর আবদুল ওহাবের নাম। এ মতের মূল কথা হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত মূল ইসলাম ধর্মের পরিবর্তনই মুসলমানদের দুরবস্থার কারণ। আদি ইসলামে ফিরে গেলে তাদের ধর্মাচার হবে শুদ্ধ এবং জাগবে দুর্গতি অবসানের আশা। ভারতে এ মতবাদের প্রথম প্রবর্তক শাহ্ সৈয়দ আহম্মদ।

পাঞ্জাবে ১৮২৬-এর শেষে শিখদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধটিকে 'জেহাদ' ঘোষণা করে নেতৃত্ব দেন শাহ্ সৈয়দ আহম্মদ। এ যুদ্ধ পরে মুসলমান ও ইংরেজের যুদ্ধে পরিণত হয়। সারা উত্তর ভারত ও বাংলা দেশ থেকে মুসলমানেরা সে যুদ্ধে যোগ দেন। ১৮৫১-তে যুদ্ধের প্রবলতা বাড়ে এবং সিপাহি বিদ্রোহের সময় তা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় দেখা দেন বিখ্যাত ওহাবি নেতা তিতু মিয়াঁ বা তিতু মির। এঁর সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাতে মনে হয় প্রজাদের অধিকার সংকোচনের বিরুদ্ধে, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সানুচর প্রতিবাদ। বাংলার মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করার এবং তাদের ধর্মাচার বিশুদ্ধ করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তাঁর যোদ্ধা দলের সংখ্যা ছিল আনুমানিক তিন হাজার। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজদের নিকট পরাস্ত হন। তাঁকে হত্যা করে কলকাতার রাস্তায় লাঞ্ছিত করা হয় তাঁর মৃতদেহ। নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করা (১৮২৮) আর ইংরেজির রাজভাষার (১৮৩৬) সম্মান লাভ—এই সময়পর্বের অন্যতম ঘটনা। খ্রিস্টান হওয়ার প্রবণতা এই সময়ে বেড়ে যায়।

এভাবেই ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে বেড়ে ওঠে বিদ্বেষ। পরিণামে সচেতন মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

সিপাহি বিদ্রোহের আগে খান বাহাদুর (পরে নবাব) আবদুল লতিফ ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হয়ে সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর উন্নতি তাঁর নজর এড়ায় না এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন দেশের বর্তমান অবস্থায় ইংরেজি-ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষায় বাংলার মুসলমান ছাত্রদের উপকার এবং তা শেখার উপায় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজিতে বিজ্ঞানাদি শেখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ। তার আগে ১৮২৫-এ মাদ্রাসায় ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা বিফল হয়। ইংরেজি-শিক্ষিত সমকালের হিন্দুদের উন্নতি মুসলমানদের প্রভাবিত করেনি। তার একটি প্রমাণ ১৮৩১-এ মুদ্রিত ইংরেজি ও পারসি ভাষার পত্রিকা 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'-র হিন্দু-মনস্কতার জন্য মুসলিম সম্পাদককে সংস্কার বিরোধী সমকালীন পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অভিনন্দন।

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার দ্বারা মুসলিম সমাজের মানসিক সচেতনতা আনয়নের জন্য ১৮৬৩-তে নবাব আবদুল লতিফ স্থাপন করেন মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা, নৌ পরিচালনা ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, আমেরিকা আবিষ্কার, সভ্যতার মোড় ফেরার কাহিনি, মুসলিম আইনের মূল নীতি—এইসব বিষয় সোসাইটির সভায় আলোচিত হত পারসি ও উর্দু ভাষায়। সভায় যথেষ্ট জনসমাগম হত। তাঁদের আপ্যায়নের ভালো ব্যবস্থা ছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (Bengal Social Science Association)-এ মুসলিম সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পঠিত প্রবন্ধে নবাব আবদুল লতিফ মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণার কথা বলেন। স্থাপনের পর জনপ্রিয় হয় কলকাতা মাদ্রাসা। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা মুসলমানদের আকর্ষণ করেনি। তিনি এজন্য একটি কলেজ স্থাপনের কথা বলেন। সভায় উপস্থিত প্যারীচাঁদ মিত্র মুসলিম সমাজে হিন্দুদের মতো স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কথা জানতে চান। মৌলভি আবদুল হাকিম উর্দুতে জানান মহামহিম পয়গম্বর পুরুষের মতো মেয়েদেরও শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে স্ত্রী শিক্ষার প্রমাণ আছে। মুসলমানগণ স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু তারা তাদের মেয়েদের অন্যান্য জাতির মতো স্কুল-কলেজে পাঠাতে চায় না। মুসলিম পুরুষদের শিক্ষার

উন্নতির সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষাও এগিয়ে যাবে। ইসলামের নির্দেশ মেয়েদের পর্দায় রাখা—এর ব্যতিক্রম তাঁরা চান না। জনৈক ডক্টর চক্রবর্তী জানতে চান যে সব হিন্দু মেয়েদের পর্দায় রাখতে চান তাঁরা মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন জানানা শিক্ষার সাহায্যে। মুসলমানগণ কি এ ব্যবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন। এর উত্তরে কী বলা হয় তা জানা যায় না।

নবাব আবদুল লতিফের কলকাতা মাদ্রাসার সঙ্গে চারটি কলেজ ক্লাস যুক্ত করার প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। তবে অংশত তাঁর চেষ্টায় হিন্দু কলেজ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমানদের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক এবং সে সময়ের বেঙ্গল কাউন্সিল-এর সভ্য সৈয়দ আমির হোসেন মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে একটি ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটিতে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া হয় কারণ তা না হলে ভারতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের পরাজয় অনিবার্য। এখন মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বীতরাগ নয়, বরং ইংরেজি না শেখার জন্য তারা অনুতপ্ত। সৈয়দ আমির হোসেন আরও বলেন মহসিন ফান্ড-এর টাকার হুগলি, রাজশাহি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে মুসলমানদের প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে না। অতএবং হুগলি মাদ্রাসা বন্ধ করে রাজশাহি ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসার টাকার পরিমাণ কমানো হোক। এর ফলে প্রাপ্ত বার্ষিক তিরানব্বই হাজার টাকা দিয়ে কলকাতা মাদ্রাসা ভবনে একটি বি. এ. কলেজ খোলা হোক। কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজ মুসলিম মহল্লা থেকে দূরে হওয়ায় যাতায়াতে ছেলেদের মাথা পিছু মাসিক কুড়ি টাকা খরচ হয়। সে ক্ষেত্রে মাদ্রাসা-দালানে কলেজ খুললে তাদের বহু সুবিধা হবে। বার্ষিক বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইংরেজ অধ্যক্ষ নিয়ে আলিগড়ে এফ. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই বার্ষিক তিরানব্বই হাজার টাকা ব্যয়ে কলকাতা মাদ্রাসার দালানে বি. এ. কলেজ চালানো সহজ। এতে সরকারি অর্থসাহায্য ব্যতীত মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা হবে। মাদ্রাসায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক করার প্রস্তাবও করা হয়।

তখনকার হিন্দু পরিচালিত পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইন্ডিয়ান মিরর' 'বেঙ্গলী' সৈয়দ আমির আলির মাদ্রাসায় কলেজ খোলার প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। কেশবচন্দ্র-দলের পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান মিরর' মন্তব্য করে এ ব্যাপারে সরকারি অর্থ ব্যয়ও সংগত। ডবলু. ডবলু. হান্টার প্রস্তাবটি সমর্থন করলেও তখনকার বাংলার ছোটো লাট স্যার অ্যাসলি ইডেন (Sir Asley Eden) বলেন এ প্রস্তাব গ্রহণের দুটি বাধা বর্তমান—(১) মুসলমানদের জন্য স্থাপিত কলেজ প্রেসিডেন্সি প্রভৃতির মতো উচ্চাঙ্গের হবে না। (২) মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ কমেনি। কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ইংরেজি বিভাগের প্রায় দশ গুণ বেশি। সারা বাংলায় বছরে বত্রিশজন মুসলিম ছাত্র এন্ট্রাস পাশ করে। তাদের মধ্যে হয়তো কুড়ি জন কলেজে যায়। এত কম ছাত্র নিয়ে একটি কলেজ চলে না। তিনি কলকাতার কলেজগুলিতে বরাদ্দ মাইনের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে মুসলিম ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নবাব আবদুল লতিফের আর একটি উল্লেখ্য কাজ মহসিন ফান্ড-এর পুনর্গঠন। তিনি মুসলমানদের আরবি-ফারসি ভিন্ন ইংরেজি শিক্ষার জন্য সে অর্থের ব্যবহারের কথা বলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। ওহাবি বিদ্রোহীরা ভারতকে বলেছিল 'দারুল হরব'—অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ অমুসলিম রাষ্ট্র—যেখানে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের কর্তব্য যুদ্ধ করা। ফলে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হন স্বাভাবিকভাবেই। এ সময়ের পারসি সংবাদপত্র 'দূরবীণ' এবং বিপিনচন্দ্র পালের 'আত্মচরিত' থেকে এ বিরূপতার প্রমাণ মেলে। এ পরিস্থিতিতে নবাব আবদুল লতিফ বিখ্যাত ধর্মাচার্য মৌলানা

কেরামত আলিকে দিয়ে ফতোয়া লেখান ভারতবর্ষ ‘দারুল হরব’ নয়, ‘দারুল ইসলাম’ অর্থাৎ ইসলামের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। কারণ ইংরেজ সরকার মুসলমানদের ধর্মকর্মে বাধা দেন না।

নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির হোসেন মুসলমানদের জন্য যে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি ভাষাসাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে তাদের সরকারি চাকরির যোগ্য করা। এই নতুন শিক্ষাকে যথার্থ কার্যকর করার জন্য জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁরা আদৌ সচেতন ছিলেন না। হিন্দুদের মধ্যে রামমোহনের কাল থেকে দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে শুরু করে। এসময় কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল নতুন শক্তি। হিন্দুরা প্রতিমাপূজা, জাতিভেদ, বিধবাবিবাহ নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এইরূপ সংস্কারের প্রয়োজন না থাকায় সম্ভবত মুসলমানগণ হিন্দু সমাজের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুন বোধ এবং তার সার্থক রূপায়ণের অশ্রান্ত চেষ্টার দিকটি বোঝেননি।

তবে আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদের মধ্যে এ চেতনার আংশিক প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বলেছিলেন ‘যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়’। এ দৃষ্টিতে কোরআনের নতুন ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন তিনি। কিন্তু আপন সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার জন্য তিনি সে চিন্তা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। মুসলমানদের জন্য ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চার কিছু ব্যবস্থা করেই তাঁকে তুষ্ট থাকতে হয়। আলিগড়ে এর বেশি কিছু হয়নি। বরং মুসলিম ধর্ম ও সমাজের পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকৃতি-অনুবর্তিতা বলে নিন্দিত হয়।

একালে মুসলিম জগতে প্রকৃত জাগরণ দেখা দিয়েছিল তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক-এর নেতৃত্বে। ১৯২৬-এ ঢাকার ‘শিখা’ সম্প্রদায় বাংলায় এরূপ জাগরণের চেষ্টা করেছিল।

নবাব আবদুল লতিফ ফরিদপুর জেলার বাঙালি আর সৈয়দ আমির হোসেন পাটনার লোক। আবদুল লতিফ আরবি-পারসির চর্চা বেশি করতেন। তবে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর মুসলিম লিটারারি সোসাইটিতে বাংলার চর্চাও হত।

১৮৮১ বা ১৮৮২ উনিশ শতকের বিখ্যাত মুসলিম নেতা প্যান ইসলামবাদের প্রচারক জামালউদ্দিন আফগানি কলকাতায় আসেন। প্যান ইসলামবাদের অর্থ বিশ্বের সব মুসলমান একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ—অতএব তাদের ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম একইভাবে করা উচিত এই বিশ্বাস।

তিনি বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে বিরোধ নেই—এ শিক্ষা দান করেন। তাঁর মত ছিল বিজ্ঞান আয়ত্ত করে মুসলমানগণ নতুন করে শক্তিশালী হোক। বিপিনচন্দ্র পালের ‘আত্মচরিত’ থেকে জানা যায় জামালউদ্দিন আফগানির কলকাতা ভ্রমণের পর এদেশের মুসলমানগণ প্যান ইসলামবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল দুটি চেতনা। একটি এসেছিল ওহাবি মতবাদ এবং ইংরেজ-ওহাবি সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। অন্যটি এল ইংরেজি না শিখে হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে-পড়া জনিত ক্ষোভ ও বাস্তব চেতনা থেকে। এই দুই চেতনার প্রভাবে মুসলমানগণ সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের উদ্যম প্রকাশ লাভ করল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্মধারায় এবং ধর্মসংস্কারের প্রয়াসে।

ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্ভব সময় জানা যায় না। তবে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ছিল সঠিক। প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার একটি প্রমাণ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু তাঁর এক লেখায় বলেন মুসলমানদের ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর মতো হিন্দুদেরও স্ব-সমাজের উন্নতির জন্য ‘মহাহিন্দু সমিতি গঠন’ করা দরকার। উক্তিটি তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রমাণ—যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম প্রধান পরিচালক ছিলেন জাস্টিস সৈয়দ আমির আলি। স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড়ে যে ধরনের মুসলিম জাগরণের চেষ্টা করেন সৈয়দ আমির হোসেনের প্রয়াস ছিল কতকটা সেরূপ। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম'-এ তিনি ইসলামের উদার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেন ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি যে রূপ নিয়েছে, মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির গতি সেই দিকেই। সৈয়দ আমির আলির গুরুস্থানীয় স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান ও ইংরেজদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টায় বাইবেল-এর উর্দু অনুবাদ করেছিলেন। ওহাবি মতবাদ ও বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরেজদের মনে জেগেছিল অবিশ্বাস। তা দূর করার জন্য চেষ্টা করেন তিন মুসলিম নেতা—নবাব আবদুল লতিফ, স্যায় সৈয়দ আহমদ ও সৈয়দ আমির আলি। সৈয়দ আমির আলি ইসলামের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা দিয়ে ওহাবি মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আমির আলির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর মাধ্যমে তাঁর প্রভাব বিশেষ কাজ করেছিল। তার ফলে বাংলার মুসলমানগণ গঠন করে নানা আঞ্জুমান বা সম্মেলন। এদের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করা এবং ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংহত ও সুস্পষ্ট করা। প্যান ইসলামবাদের কিছু ছায়া এসব আঞ্জুমানের উপর পড়েছিল। তার ফলে বাংলার মুসলমানেরা বহির্ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির কথা ভাবতে শুরু করে এইমাত্র।

এ যুগে কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের জন্ম হয়। তাঁরা কতকটা হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনুসরণে মুসলমানদের অতীত-গৌরব কথা একটু উচ্চস্বরে প্রচার করেন। এসবই ঘটেছিল কংগ্রেসের সূচনাকালে ও তার কিছু পরে।

মৌলানা কেরামত আলি ওহাবিদের মতের বিরোধী ফতোয়া দিয়ে বলেন ভারতবর্ষ 'দারুল ইসলাম' অর্থাৎ মুসলমানের মিত্র দেশ। কিন্তু ওহাবিপন্থীদের মতোই আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তন-মূলকতাই ছিল তাঁর ধর্মসংস্কারের ভিত্তি।

এদেশের শিক্ষিত মুসলমানগণ ধর্মের নিয়ম-কানুনের কিছু খবর রাখতেন আর পোশাক ও আদব-কায়দায় মুসলমানি রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সাধারণ মুসলমানদের ধর্মমতে কিন্তু ইসলামের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল হিন্দু-বৌদ্ধ মতবাদ। তাঁদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে দেখা যেতে এর প্রকাশ। তাঁরা পিরের স্থানে মানত করতেন, করতেন ওলাবিবি, শীতলা, লক্ষ্মী, হাজরা ঠাকুর প্রভৃতি লোকদেবতার পূজা। কোনো কোনো মুসলমান দুর্গা ও কালীপূজা করতেন। তাঁর চিন্তাজগতেও লক্ষিত হত নানা মতের মিশ্রণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে আলিরাজা ওরফে কানু ঠাকুরের 'জ্ঞানসাগর' কাব্যের নাম করা যায়। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত কাব্যটির রচনাকাল আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ। কাব্যটিতে মোহাম্মদ আর কৃষ্ণের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে। বাউলদের চিন্তায়ও দেখা যায় অনুরূপ মিশ্রণ। ইসলামি শরিয়ত অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে পালনীয় নিয়মাদির কোনো প্রভাব বাউলদের মধ্যে নেই। গুরু বা মুর্শেদ তাদের সত্য পথের দিশারি, লক্ষ্য 'নিরঞ্জনলাভ' বা মহাসুখের অনুভব।

মৌলানা কেরামত আলি এসব আচার ও মত দূর করে তাদের চিরাগত মুসলিম ধর্মাচার ও বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। আঞ্জুমানগুলিকে কেন্দ্র করেও চলতে থাকে একই কাজ। এই মুসলমানীকরণ উনিশ শতকের বাংলার একটি উল্লেখ্য ঘটনা। মৌলভি-মৌলানারা কিছু জবরদস্তি করলেও মোটের উপর বিনা বাধায় একাজ হয়। কারণ মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট আচার-ব্যবহারের তুলনায় প্রাচীন ইসলামি আচার অনেক ক্ষেত্রেই ভালো ছিল। গুরু অপেক্ষা পয়গম্বরের আনুগত্যের গৌরব অধিক—এ যুক্তি খণ্ডন করতে পারেনি বাউলগণ। তবে তাদের গানে মাঝে

মাঝেই শোনা যেত ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতার কথা। মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন ক্ষীণকণ্ঠে হিন্দুদের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য গোহত্যা বন্ধের কথা বলে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল পর্যন্ত এভাবেই বাংলার মুসলমানগণ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পশ্চাৎপদ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়। অথচ এ সময়েই কেশবচন্দ্র ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা মানবজীবনের অধিক গৌরবের কথা প্রচার করেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বাংলা—এমনকি কোনো কোনো মুসলিম মনীষী মানবমহত্ত্বের কথা বলেন। স্যার সৈয়দ আহমদের শিষ্যস্থানীয় মুসলমান কবি হালী যা বলেন তার মর্ম—মানুষের কাছে আসবে মানুষ—এটাই শ্রেষ্ঠ ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর-আরাধনা। এই অতি প্রয়োজনীয় নতুন জীবনচেতনা তেমন করে পৌঁছোয়নি মুসলমানদের কাছে। তাদের অন্তরাত্মা গ্রহণ করতে পারেনি এই সূক্ষ্ম নবজীবন-সঞ্চারী অনুভব। সে কারণেই বাংলার নব জাগরণ মুসলিম সমাজের কাছে পৌঁছোয়নি বলা যায়।

পঞ্চম বক্তৃতা তথা পঞ্চম অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ মূলত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কর্মপ্রণালী এবং রেনেসাঁস-এর সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। তারই সঙ্গে প্রথম অংশে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা তথা আন্তর্জাতিক চেতনার বিকাশের স্তর পরম্পরা আর থিয়সফি ও হিন্দু পুনর্জাগরণের দিকটিও বিশ্লেষণ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি হিন্দুর জাগরণকে সর্বভারতীয় করে তোলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে। ধর্মের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার বিলোপ করার সাধনা ছিল কেশবচন্দ্রের। তাই বাইবেল আর সমকালীন ইউরোপীয় ধর্মবাদীদের চিন্তাধারার আধ্যাত্মিক দিকটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ মনোভাব ফরাসি বিপ্লব এবং তার পরের ইউরোপের নব মানবতা আর নতুন মানসিকতা গ্রহণের পরিচায়ক। প্রবল স্বাদেশিকতা আর আন্তর্জাতিকতা এসময় বাংলায় বড়ো হয়ে উঠেছিল।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার বয়স উনিশ থেকে বাড়িয়ে বাইশ করা। সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় এ ব্যাপারে সর্ব ভারতীয় সমর্থন পাওয়া যায়। একমাত্র উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ সমর্থন করেননি এই প্রয়াস; কারণ সিপাহি বিদ্রোহ ও ওহাবি বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতি। ইংরেজ-সমর্থক স্যার সৈয়দ আহমদের মধ্যে দেশপ্রেমের সঙ্গে মিশেছিল স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর প্রীতি। তিনি ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গঠন করে তাদের বিপদমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সে কারণে সুরেন্দ্রনাথের সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার মনোভাব তাঁকে শঙ্কিত করে। তিনি কিন্তু উন্নতিশীল বাঙালিদের শ্রদ্ধা করতেন এবং মুসলমান ধর্ম ও সমাজের পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর এই বাধাদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য এই বাধায় ক্ষান্ত না হয়ে ভারতের সকল প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কাজ চালিয়ে যান। তাঁর এ প্রয়াসের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সুরেন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আর কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার কর্ম এ সময়ের বাংলার শ্রেষ্ঠ উদার মানবিক এবং সৃষ্টিধর্মী কাজ।

এ সময়ে বাংলায় প্রতিক্রিয়াধর্মী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদও পুষ্ট হতে থাকে ব্রিটিশ শাসকের বিরূপ মনোভাবের ফলে। ব্ল্যাক অ্যাক্টস (Black Acts)-এর সময়ে ইংরেজের বিরূপ মূর্তি বাঙালি প্রথম দেখেছিল। বাঙালির শক্তির নব নব স্ফুরণের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিরূপতা বাড়তে থাকে।

শিক্ষিত বাঙালি সমাজ যখন আপন অধিকার বুঝে নেবার জন্য আগ্রহী হল তখন ব্রিটিশ সরকার যেন নিঃসন্দেহ হল ভুল করে বাঙালিকে সে এতটা বৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছে। সে ভুল সংশোধনের চেষ্টায় সরকার বাঙালির উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হ্রাস করল, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কড়া ব্যবস্থা নিল আর অস্ত্রশস্ত্র রাখার পথে বাধা সৃষ্টি করল। বাঙালির

বিকাশশীল মন বাধাগুলিকে অবাঞ্ছিত মনে করল; ইংরেজের সঙ্গে তার নিবিড় প্রীতির সম্পর্কে দেখা দিল ফাটল। এসময়ে ঘটে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনা—ভারতে থিয়সফির আবির্ভাব এবং ইলবার্ট বিল প্রণয়ন।

ভারতে থিয়সফির ব্যাখ্যাতা রূপে এলেন মাদাম ব্লাভাট্স্কি (H. P. Blavatsky : ১৮৩১-১৮৯১) এবং কর্নেল ওলকট (Col. Henry Stel Olcott : ১৮৩২-১৯০৭)। তাঁদের মূল বক্তব্য হিমালয়ের অগম্য অঞ্চলে আছেন বহু মহাযোগী। তাঁরা সেখান থেকে যোগবলে বা আত্মিক বলে জগতের ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং মানুষের নব নব উন্নতি সম্ভব করছেন। হিন্দু দেবদেবীগণ মিথ্যা নন, মিথ্যা নয় তাঁদের দিব্য শক্তির প্রভাব।

বাংলার সংস্কার আন্দোলন শিক্ষিতদের মধ্যে সীমিত ছিল; সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়নি। শাসকগণ এরপর দেশের উন্নতিতে আনল বাধা। এই পরিস্থিতিতে থিয়সফি ব্যাখ্যাতাদের মুখে দেশীয় দেবদেবী ও হিমালয়স্থ মহাযোগীদের অপূর্ব শক্তির কথা সোজাসুজি অবিশ্বাস করতে পারলেন না শিক্ষিত সমাজ।

ইলবার্ট বিল-এ প্রস্তাব করা হয় কয়েক শ্রেণির ভারতীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট বিচার কার্যে ইউরোপীয় জজ আর ম্যাজিস্ট্রেটদের সম মর্যাদা পাবেন। এ প্রস্তাব দেশস্থ ইউরোপীয়দের বিদ্রোহী করে তোলে। দেশীয় বিচারকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে তারা ভারতীয়দের আক্রমণ করল। তাদের মতে প্রতিমাপূজক, জাতিভেদে বিশ্বাসী ভারতীয়গণ নৈতিক দিক দিয়ে ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা হীন। অতএব তাদের বিচারের যোগ্যতা এদের নেই।

মর্যাদার উপরে এ আঘাতের ফল হল বিচিত্র। এতদিন ভারতীয়গণ বিশেষত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা স্বদেশের নানা রীতিনীতি, মত ও বিশ্বাসের কঠিন সমালোচনা করে আসছিলেন। ইউরোপীয়দের এই গর্বিত অপমানকর ব্যবহারে তাদের মানসিকতা পালটে গেল। এক দিকে ইউরোপীয় সমাজের দোষত্রুটির সমালোচনা শুরু হল, অন্য দিকে বাল্যবিবাহ, প্রতিমাপূজা, জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা শুরু হল। (থিয়সফির প্রচলন কালে উত্তরভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্থাপন করেছিলেন প্রতিমাপূজা-বিরোধী, বেদ অনুবর্তী আর্য সমাজ। এ সমাজে অন্য ধর্মের ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হয়ে প্রবেশ করতে পারত। উত্তর ভারতে আর্য সমাজের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।))।

এই পরিবর্তিত মনোভাবের চিত্র দেখা গেল সাহিত্যে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) কিছু কবিতায় আছে বাঙালি মনে ইংরেজস্তুতির অশোভন রূপান্তরের চিহ্ন।

যে আত্মবিশ্বাস-বলে এদেশীয়গণ ইউরোপীয়দের আঘাত করতে পেরেছিল তারই বিশেষ প্রকাশ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল এর উৎস। প্রথমে কংগ্রেস শান্তভাবে সরকারকে দেশের মানুষের বিশেষত শিক্ষিত সমাজের উপকারের পথ প্রদর্শনের প্রয়াসী হয়। কিন্তু জাতির আত্মপ্রকাশের যে তাগিদ কংগ্রেসের উৎস তা তাকে শান্ত থাকতে দিল না। সরকার প্রথমে কংগ্রেসকে উপেক্ষা করলেও পরে গুরুত্ব দেয়। তার প্রমাণ সরকারি কর্মচারীদের কংগ্রেসি-প্রভাব মুক্ত রাখার দিকে নজর দেওয়া হয়।

কংগ্রেসে যোগদান বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের নিষেধ সব মুসলমান মানে না। কংগ্রেস ক্রমে নবীন ভারতের ধর্ম-বর্ণ-প্রদেশ অতিক্রমী অধিকার-সচেতন জীবনবোধ থেকে রস আহরণ করে শক্তি লাভ করে।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ দেখা দিল অদ্ভুতভাবে। এই অদ্ভুতত্ব হয়ে উঠল শক্তি। এই নতুন শক্তি ও তার সাধনা মূল্যবান হলেও দেশের শিক্ষিত শ্রেণির কম মানুষই তার তাৎপর্য বুঝে ঠিকমতো গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৮৪৫-এ খ্রিস্টান পাদ্রিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সনাতনী হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মিত্রতা হয়েছিল। এ সময়ে তার সাময়িকত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ সনাতনীরা শক্তি সঞ্চয় করে সংস্কারপন্থীদের শক্তিহীন করে দেয়।

রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিতর্ক থেকে বোঝা যায় ধর্মের মূল কথা যে নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তা মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পারেননি। ধর্ম তাঁর কাছে ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্রপ্রয়োগের মতো প্রক্রিয়া মাত্র। ১৮৮০-র কিছু পরে আবার এই চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির প্রচেষ্টায়। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে তর্ক হয়। শশধর তর্কচূড়ামণির মতে ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়; সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের নিকট ব্রাহ্মদের মতো প্রার্থনা অর্থহীন। এই ঈশ্বর-উপাসনার প্রকৃত পথ হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রতীক উপাসনা। কারণ তা সহজে মানুষ গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে লৌকিক ব্যাপার। লৌকিক রূপবাদ দিয়ে যা ভাবা যায় তা সহজবোধ্য নয় বলেই তাতে সুফলের আশা নেই। ধর্মের আসল কাজ যে মানুষের নৈতিক চেতনার উদ্দীপন সে সম্পর্কে শশধর চিন্তা করেননি। শশধর তর্কচূড়ামণির মত বেশ জনপ্রিয় হয় বিশেষত তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োগের কারণে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কিছু বক্তৃতায় উপস্থিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত বলেন এই হিন্দুধর্ম আধুনিক কালের অনুপযোগী। তাঁর যুক্তি রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও খুশি করেনি। তথাপি শশধর তর্কচূড়ামণির তৎকালীন জনপ্রিয়তার কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের বেশির ভাগ সদস্যের ভাববিলাসের আধিক্য। ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তার উপর জোর দেওয়ায় সেই ভাববিলাসের ঘোর সহজেই কেটে যায়। কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হলেই তার প্রতিক্রিয়া হয় প্রবল। তাই ঈশ্বর-নাম কীর্তনের অতিরেক সহজেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা অমনোযোগের রূপ নেয়।

এরপরে আসে সনাতন হিন্দু ধর্মের সর্বাত্মক জাগরণ—ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক বাঙালিও যার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেনি। তার কারণ শুধু তর্কচূড়ামণির নতুন ব্যাখ্যা নয়; হিন্দু জাতীয়তাবাদ মন্থরগতি ব্রাহ্মদের (আদি ব্রাহ্ম সমাজ) মধ্যে, বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেবের রচনায় ক্রমপুষ্ট হয়ে উঠছিল। তার সঙ্গে থিয়সফিক্যাল আন্দোলন, রাজনীতি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা যুক্ত হয়ে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদকে করল শক্তিশালী। শেষের দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের অসাধারণ সাধনা আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যাদান ও বলিষ্ঠ প্রচারে এই ভাবধারা আরও শক্তি লাভ করল। অনেকে বলেন এঁদের সাধনায় উনিশ শতকের রেনেসাঁস হয়েছে সবচেয়ে সফল।

রামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় অলৌকিকতা পেয়েছে অধিক গুরুত্ব। তথাপি তাঁর সাধনায় পাওয়া যায় গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য।

আনুমানিক ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দম্পতির পুত্র রামকৃষ্ণের জন্ম। শৈশবে পড়াশোনা তেমন হয়নি। তবে গান, অভিনয়, ছবি আঁকা মূর্তি গড়ার সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ শ্রবণও তাঁর প্রিয় ছিল। এসময় ভাবাতিশয্যে মাঝে মাঝে তাঁর মূর্ছা হত। এসব থেকে তাঁর মনের গঠন, আচরণ প্রচারের ধারা বোঝা সহজ হয়।

তরুণ বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হন। রামপ্রসাদের গান তাঁর প্রিয় ছিল। ক্রমে রামপ্রসাদের মতো কালীকৃপা লাভের কামনা তাঁর মনে প্রবল হয়। আকুল আর্তিতে কালীমূতির সামনে আত্মহত্যায় উদ্যত তাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন সর্বব্যাপ্ত এক চিন্ময় সত্তার রূপ। পরে তিনি তান্ত্রিক সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, অদ্বৈত সাধনা—হিন্দু ধর্মের এসব সাধনার সঙ্গে সুফিমত ও খ্রিস্টীয় সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন। এভাবে তিনি উপলব্ধি করেন এক পরম সত্যই সব ধরনের সাধনা ও ধর্মের অন্বিষ্ট। ক্রমে সিদ্ধপুরুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। ১৮৭৬-এ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তাঁর পরিচালিত পত্রিকায় রামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা মুদ্রিত হয়। এভাবে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু) সমাজে রামকৃষ্ণের খ্যাতি ছড়ায়।

পোশাক সন্ন্যাসীর না হলেও বিবাহিত রামকৃষ্ণ ছিলেন পুরো সন্ন্যাসী। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নারী সম্পর্ক বর্জনের মত পোষণ করতেন। আসলে তাঁর সাধনা ছিল ইহজীবনবিমুখ মধ্যযুগীয় সাধনা। তথাপি কয়েকটি কারণে তাঁর প্রভাব এশ্রেণির অন্যান্য সাধকের চেয়ে বেশি—

(১) হিন্দু ও অহিন্দু—উভয় মতের সাধনা করেছিলেন রামকৃষ্ণ। এভাবে বাংলা দেশের বিশ্বমুখী সাধনার সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়। দেশের প্রাচীন পন্থার সাধনায় এ ছিল এক নতুন ব্যাপার।

(২) উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজে ছিল প্রতিমাপূজা-বিরোধী মনোভাব। রামকৃষ্ণের সাধনা থেকে আকার ও নিরাকার সাধনার সমমূল্যতা বুঝেছিলেন এই সমাজ। বর্ধনশীল হিন্দু জাতীয়তাবাদ তাঁর এ সাধনা থেকে লাভ করেছিল বিশেষ আনুকূল্য।

(৩) রামকৃষ্ণের মতো প্রায় নিরক্ষর ব্যক্তির গভীর জ্ঞানপূর্ণ বাক্যালাপ; বিশেষত ভাব-সমাধির আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার।

(৪) শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বব্যাপ্ত খ্যাতি রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক খ্যাতিকে বর্ধিত করে।

ফরাসি মনীষী রমাঁ রলাঁ (Romain Rolland : ১৮৬৬-১৯৪৪) রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে অন্তর্মুখীনতা কখনও কর্মপ্রবণতাকে ক্ষুণ্ন করেনি। ভারতের অন্তর্মুখী সাধনাই তার জাতীয় পুনরুত্থানের ভিত্তি। কারণ কর্মশক্তির উৎস আত্মা। পাশ্চাত্যের বহির্মুখ জাতিদের উচিত আপন আত্মায় সৃষ্টিধর্মী শক্তির উৎস সন্ধান। নতুবা ব্যাপ্ত যান্ত্রিক জ্ঞানই হবে তাদের ধ্বংসের কারণ। আধুনিক ইউরোপের বহির্মুখীতার জন্য তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন রোলাঁ। তাই রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শক্তিমান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চরিতকথার দিকে তিনি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ এঁদের মধ্যে লক্ষিত হয় একালের আধ্যাত্মিক সাধনার চরমোৎকর্ষ। প্রসঙ্গত তিনি প্রাচীন ইউরোপের উন্নত আত্মিক সাধনার কথাও বলেছেন। কিন্তু আত্মিক বা মরমিসাধনার অবাঞ্ছিত রূপ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না।

আত্মিক সাধনার বিকৃত পরিণাম কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে লক্ষিত হয়। রামকৃষ্ণের ভগবৎ-উপলব্ধি কেশবচন্দ্রের তুলনায় অনেক গভীর ছিল। ঈশ্বরচেতনা এবং তার অনুষঙ্গ ভগবৎ-নির্ভরতা যে মানুষকে সহজে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে উৎকৃষ্ট উদাহরণ রামকৃষ্ণের জীবন।

কিন্তু তাঁর এই ঈশ্বরচেতনা ও নির্ভরতা অনেক সময় এত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে যে লোককল্যাণের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় ছিন্ন নতুবা শিথিল হয়েছে। কোমলমনা হলেও লোকশ্রেয় সম্পর্কে তাঁর চিন্তা যে সুবিকশিত হয়নি তার প্রমাণ তাঁর বাণীতেই আছে।

রামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরলাভ যাঁরা করেন তাঁদের আচরণ হয় জড়, বালক, উন্মাদ বা পিশাচের মতো। কিন্তু পৃথিবীর বহু সুপরিচিত ঈশ্বরভক্তের আচরণ এরূপ ছিল না। রামকৃষ্ণের আচরণও ছিল কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন সাধারণ মানুষের মতো, বালক, উন্মাদ বা পিশাচের মতো নয়। সৌম্য, সচেতন, শান্ত, মৈত্রী ও করুণা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বই সর্বকালের মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য। লোককল্যাণও এসেছে এই পথে। জনমঙ্গলের সঙ্গে যোগহীন ভগবৎ-চেতনা বা নির্ভরতা বা লোককল্যাণের প্রেরণাহীন ঈশ্বরনির্ভরতা উচ্চশ্রেণির ভাববিলাস মাত্র। প্রগল্ভ ভক্তির অবাঞ্ছিত পরিণাম বার বার মানব-ইতিহাসে দেখা গেছে।

রামকৃষ্ণের চিন্তার আর এক দুর্বলতা হিন্দু সংস্কারকে চিরন্তন বলে গ্রহণ করা। কাশীর শ্মশানে তিনি শিব ও

শিবানীকে মৃতাত্মার মুক্তিদাতা হিসেবে দেখেছিলেন। স্থানবিশেষে মৃত্যুর ফলে আত্মার সদ্‌গতি সম্ভব—এ ধারণা ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কার মাত্র। এ চিন্তায় ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ কেউ না জানলেও তাঁকে সুন্দর, মহতের বিধাতা বলে বিশ্বাস করা হয়। সেই সুন্দর ও মহতের ক্লান্তিহীন অন্বেষণই মানুষের কর্তব্য—মানব-অন্তরে এটাই বিধাতার চিরন্তন নির্দেশ। সুন্দর, মহৎ আর ন্যায় লাভের পথে অশ্রান্ত চেষ্টার সহায়তাই মানুষের মরমি সাধনের প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু স্ব-সম্পূর্ণ মরমি সাধনা এ তাৎপর্য বজায় রাখতে পারে না বলেই ব্যর্থ হয়। রামকৃষ্ণদেবের সাধনায় এ সম্ভাবনা ছিল। তাঁর অলৌকিক দর্শনও সব মরমি সাধনার সাধারণ দুর্বলতা।

পরমহংসদেবের বিখ্যাত চিন্তা 'যত মত তত পথ'—এর মূল্য সম্বন্ধেও আছে সংশয়। কারণ কোনো কোনো মতকে (যেমন বামাচার) তিনি যোগ্য মনে করেননি আর সন্ন্যাসের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল পক্ষপাত।

তিনি এই কথা বলে কেশবচন্দ্রের মতো মানুষকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ শুভেচ্ছার মূল্য কম নয়। তবে তাঁর শিষ্যরাও 'যত মত তত পথ'কে সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন—যদিও তা বিচারসহ নয়। কারণ সব ধর্ম সত্য—এ চিন্তা সঠিক নয়। সকল ধর্মের মধ্যেই আছে বহু মিথ্যা বা অসফল ভাবনা—তাদের অতিক্রম করার চিন্তাই সত্য চিন্তা। ধর্মের যথার্থ অর্থ মনুষ্যত্বের সাধনা। আনুষ্ঠানিক ধর্ম যদি এই মনুষ্যত্ব-সাধনার সহায়ক হয় তবেই তা প্রকৃত ধর্ম, নতুবা তা আচার মাত্র। মানবতার সাধনা সর্বদা আনে নতুন নতুন দাবি। তাই ধর্ম কী—তার সন্ধান অতীতের চেয়ে বর্তমানে করাই কর্তব্য। তার সঙ্গে চাই বর্তমান কেমন করে ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে সচেতনতা। 'যত মত তত পথ' চিন্তায় অতীত-প্রভুত্ব অধিক বলেই তা তত্ত্বকে ছাড়িয়ে যথার্থ সত্য হয়ে উঠতে পারেনি।

মানুষের সর্বাপেক্ষা বড়ো সম্পদ সৃষ্টিশক্তি। 'যত মত তত পথ' সৃষ্টিমূলক চিন্তা নয়, স্থূল একটি চিন্তা মাত্র। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা কালে রমাঁ রলাঁ বিশ্বমৈত্রীর উদ্দীপনায় তা লক্ষ করেননি।

পরমহংসদেবের আর এক পরিচিত মত সব ধর্মই ত্রুটি সত্ত্বেও সত্য। কারণ সকল ধর্মের আসল কথা ঈশ্বরাকূতির গভীরতা। রমাঁ রলাঁ এইমত সমর্থন করেছেন। আপাতভাবে সমর্থনযোগ্য মনে হলেও মতটি যুক্তিসংগত নয়। এটি একটি শিথিল চিন্তামাত্র। ত্রুটিহীন হওয়ার অশ্রান্ত প্রয়াসই দেশ ও জাতির উন্নতির সঠিক পথ। এ দিক দিয়েও রামকৃষ্ণের এ বাণী যথার্থ নয়।

ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা মানুষকে নিয়ে যায় শুদ্ধতা ও পবিত্রতার দিকে। রামকৃষ্ণের বাণীতে এ সত্য উপেক্ষিত। তুলনায় সত্য গ্যেটে ও বুদ্ধদেবের বাণী। গ্যেটে বলেছেন জীবন ও স্বাধীনতা তারই লভ্য ও ভোগ্য যে প্রতিদিন নতুন করে এ দুটি জয় করে নেয়। বুদ্ধদেব বলেছেন প্রতিদিন স্বীয় শীল অখণ্ড রাখা ও সর্ব প্রাণীর সুখের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ সমেত একদল ভক্ত পরমহংসদেবকে অবতার মনে করতেন। সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণ, ভাব সমাধি, হিন্দুর প্রিয় গুরুবাদ ও অবতারবাদের প্রশংসা, মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে বিবেকানন্দের বিশ্বজয়—এসবের সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন অবতার। পরিণামে চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিধর্মিতার পরিবর্তে পুরোনো, শক্তিমান লৌকিক সংস্কারই জয়ী হল।

অবতারবাদের প্রতি ঝোঁক একালের পক্ষে সংগত নয়। এরূপ প্রয়াসে জাতির শক্তি ও সময়ের বড়ো ধরনের

অপচয়ই হয়। তবে রামকৃষ্ণ দেবের চিন্তা ও সাধনা কিছুটা ভিন্ন রূপ পায় বিবেকানন্দের কর্মধারার মাধ্যমে।

স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ; জন্ম কলকাতার সিমলায়। তিনি ছিলেন পড়াশোনা, গান, খেলাধূলা, কুস্তি—সর্ব বিষয়ে আগ্রহী প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল এক যুবক। তরুণ বয়সে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং তখনই তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিলেন। এসময়ই তিনি কান্ট (Kant)-এর দর্শন পাঠ করেন এবং সংশয়বাদী দর্শনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়। তিনি এমন কারও সন্ধানে ছিলেন যিনি নাস্তিক্য থেকে মুক্তি দিয়ে ঊর্ধ্বায়িত করবেন তাঁর চিত্ত। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার বাসনা নিয়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু মহর্ষির উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হননি। রামকৃষ্ণ পরমহংস এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন এবং নরেন্দ্রনাথকে দেখাতে পারেন।

প্রথমাবধি পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন। কারণ তাঁর ধারণা হয় নরেন্দ্রনাথ অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করেননি নরেন্দ্রনাথ। তিনি রামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শনকে মনোবিভ্রম (Hallucination) বলে উড়িয়ে দিতেন। অসীম সাহস আর অকপটতা ছিল নরেন্দ্রনাথের সম্পদ। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে ঈশ্বর দর্শন করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করায় ভাবাবস্থায় তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেন। সে স্পর্শে কিছুক্ষণের জন্য নরেন্দ্রনাথের চোখের সামনে থেকে বাস্তব জগৎ লুপ্ত হয়। তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে এরপরেও তিনি রামকৃষ্ণের দ্বারা ততটা প্রভাবিত হননি। সংশয়বাদের দিকে তাঁর প্রবণতা থেকে যায়।

রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের গান শুনতে ভালোবাসতেন, তিনিও শোনাতেন। ক্রমে পরমহংসদেবের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে নরেন্দ্রনাথের আস্থা জাগে এবং তাঁর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতি অনুরাগ গাঢ় হলেও সংশয় থেকে মুক্তি পান না তিনি। এ সময়ে বৌদ্ধগয়ায় খনন কার্য চলছিল। ১৮৮৪-তে তা শেষ হয়। নরেন্দ্রনাথ বৌদ্ধগয়া যান এবং বুদ্ধের প্রতি তীব্র আকর্ষণ নিয়ে ফিরে আসেন। ১৮৮৭-তে স্যার এডুইন আর্নল্ড (Sir Edwin Arnold)-এর 'লাইট অফ এশিয়া' ('Light of Asia)-এই বিখ্যাত বুদ্ধজীবনী প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথ সেটি পড়েন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর যুবক নরেন্দ্রনাথই গ্রহণ করেন তরুণ গুরুভাইদের দায়িত্ব। দারুণ অর্থসংকট সত্ত্বেও তপস্যায় দিন কাটতে থাকে তাঁর। তপস্যায় বা ধ্যানে অনুরাগ সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের মনের অশান্তি দূর হয় না। কিছুকাল পরে তিনি সন্ন্যাসীবেশে একা সারা ভারত ভ্রমণ করেন। এ সময় কঠিন অসুখ ও নানা বিপদের সম্মুখীন হন তিনি, অনশনে কাটে অনেক দিন। আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসে তিনি সব বিপদ কাটিয়ে ওঠেন। এ সময়ই তিনি ভারতের নিম্নবর্গীয় মানুষদের দুর্গতি সম্বন্ধে যেমন অবহিত হন তেমনই পরিচিত হন পণ্ডিতসমাজ, রাজা-মহারাজা শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে। তখনই তিনি বিবেকানন্দ উপাধি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত করেন—(১) দেশের শিক্ষিত ভদ্রসমাজ সমাজসংস্কার নিয়ে মত্ত। সাধারণ জনতাকে শোষণ করে তারা বেঁচে আছে কিন্তু তাদের উপকারের জন্য কিছুই করছে না।

(২) জনতা অজ্ঞ এবং উচ্চ শ্রেণির অত্যাচারের ফলে ব্যক্তিত্বহীন। তারা ধর্মহীন নয়। কিন্তু তাদের ধর্মশিক্ষা দানের যোগ্যতা শিক্ষিত সমাজের নেই।

এ অবস্থায় কর্তব্য—(১) সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, (২) তাদের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দেওয়া, (৩) আত্মবিশ্বাস জাগানোর প্রধান উপায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদের প্রসার।

এসব কাজের জন্য চাই অর্থ। বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে আপন বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের কথা ভাবেন। তৎকালীন মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) ভক্তদের সহায়তায় তিনি ১৮৯৩-এ আমেরিকার শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলন-এ যোগ দেন। সেখানে তাঁর হিন্দু ধর্মের, বিশেষত অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হন শ্রোতাগণ। বিবেকানন্দ লাভ করেন বিশ্বখ্যাতি। এরপর আমেরিকা ও ইংল্যান্ড-এ হিন্দু ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করে সংগৃহীত অর্থে তিনি গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণ মিশন। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের এক পরিচালক বলেন বিবেকানন্দের বক্তৃতার দার্শনিক গভীরতা, আধ্যাত্মিক আবেগ, চিন্তার নিজস্বতা মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সমবেদনার প্রকাশ আমেরিকার শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) মতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা ছিল অন্তরোৎসারিত, যুক্তিপ্রধান নয়। বস্তুত বিবেকানন্দের শক্তির উৎস ছিল তাঁর বিশাল হৃদয় এবং দিব্য যৌবন। আমেরিকা যাওয়ার আগে গুরুভাই তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন তথাকথিত ধর্মের চেয়ে অনুভবই তাঁর কাছে বড়ো। বুদ্ধকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। ‘প্র্যাকটিকাল বেদান্ত’ (‘Practical Vedanta’) নামের বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি বলেছেন স্বর্গ-নরক, আত্মার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়ে তর্কের চেয়ে দৃশ্যমান জগতের দুঃখই বড়ো। তাই বুদ্ধের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ, বৈদান্তিক, খ্রিস্টান, মুসলমান—এসব ক্ষুদ্র আমির চেয়ে বড়ো প্রকৃত আত্মার প্রকাশ। এ-ই তাঁর জীবনদর্শনের যথার্থ প্রকৃতি।

বিবেকানন্দ নিজেকে বলতেন বেদান্তবাদী এবং বেদান্তের সোহম্, তত্ত্বমসি প্রভৃতি চিন্তা ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো অবিচলিত ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস তাঁর ছিল না। রামমোহনের মতো ব্রহ্মবোধ আর জগতের ব্যবহারিক সত্তাবোধের স্থিরতাও তাঁর মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। মানবপ্রেম বিশেষত দেশপ্রেমের জন্য সারা জীবন বেদান্ত এবং সংশয়বোধের মধ্যে দোলাচলতা ছিল তাঁর চিত্তে। দার্শনিকতা বা তত্ত্বচিন্তা বিবেকানন্দের প্রতিভার গৌণ দিক। প্রেমধর্মের গভীরতার জন্য বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হলেও বুদ্ধের মতো স্থৈর্য থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কারণ তাঁর অনুভূতি-প্রধান মানসিকতায় মানবদুঃখ-মোচনের তাগিদই বড়ো ছিল।

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের মানুষ; সমকালের শিক্ষা ও সংস্কারে বর্ধিত। তাই তাঁর গুরুর জগতের সঙ্গে তাঁর জগতের মিল ছিল না। রামকৃষ্ণ দেবের দয়ার্দ্র চিত্ত ক্বচিৎ দুঃখীর দুঃখ নিবারণে উদ্বুদ্ধ হলেও রামকৃষ্ণ মিশন বা সেবা সংঘের মতো কোনো সংগঠনের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। তাই বিবেকানন্দ গুরুভাইদের এ পথে সহজে আনতে পারেননি।

রামকৃষ্ণের ‘যত্র জীবন তত্র শিব’—এ বাণী থেকে সেবার প্রেরণা লাভের কথা বলেছেন বিবেকানন্দ। গুরুর সে শিক্ষা তাঁর কাছে হয়েছে ‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।’ দুটি বাণী কিন্তু এক নয়। প্রথমটিতে জোর পড়েছে শিবত্বের উপর; দ্বিতীয়টিতে জোর জীবের উপর।

বিবেকানন্দের মধ্যে প্রায় সারা জীবন সোহম্‌বাদ ও সংশয়বাদের দ্বন্দ্ব চলছিল। শেষজীবনে তা লুপ্ত হয় এবং তিনি একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত হয়ে ওঠেন। তথাপি মানবপ্রেম এবং দেশপ্রীতিতেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সেই সময়ের বাংলার সাধনার বিশ্বমুখীনতা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। তাঁর বিদ্যাচর্চার ব্যাপ্তি, সব ধর্ম ও সমাজের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, সংকীর্ণ হিন্দুত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা—সেই সময়ের ফসল। বিবেকানন্দের মধ্যে প্রগাঢ় দেশপ্রেমের যে প্রকাশ লক্ষিত

হয় তার উৎসও সম-সময়। কারণ তাঁর পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। অবশ্য শশধর তর্কচূড়ামণি ও থিয়সফিস্টদের অদ্ভুত মত কেউ-ই গ্রহণ করেননি। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল শাসকশ্রেণির অবজ্ঞা এবং এক শ্রেণির শিক্ষিত বাঙালির স্বদেশচেতনার অভাব। স্বামী বিবেকানন্দ শেষ কারণটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সামান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড়ো সংগ্রামের আয়োজনে তাঁর শক্তি এবং জাতির সময় নষ্ট হল। হিন্দু বা দেশের নব চেতনাকে অবজ্ঞাকারী পূর্বোক্ত দলের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের যোগ স্থাপিত হয়। তাই কম সংখ্যক হলেও এ সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলে সংস্কারপন্থী দেশপ্রেমিকদেরও লোকে স্বদেশকে অবজ্ঞাকারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করল। আর পরিবর্তনভীত অদ্ভুত মতবাদীগণ স্থান পেল জাতীয়তাবাদীদের দলে।

জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাশিথিলতা ক্রমে আদি ব্রাহ্ম সমাজের (ওদুদ এঁদের বলেছেন মন্থরগতি ব্রাহ্ম) মধ্যেও সংক্রমিত হল। বিবেকানন্দের মধ্যেও দেখা গেল নানা দুর্বলতা, সংস্কারপন্থাকে তিনি দেখলেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। অথচ সৃষ্টিধর্মিতার সঙ্গে সংস্কারের যোগ অবিচ্ছেদ্য।

অস্পৃশ্যতা ও জাত্যভিমানের ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার বুঝলেও বিবেকানন্দ দুটি ক্ষেত্রেই অবজ্ঞা প্রদর্শন ভিন্ন কিছু করতে পারেননি। কারণ প্রথমাবধি তিনি ছিলেন সংস্কারবিরোধীদের দলভুক্ত।

তাঁর হিন্দু ধর্মে নতুন শক্তি সঞ্চার করার কাজেও বিভ্রাট দেখা দিল। হিন্দুর ধর্মজীবনে নতুন শক্তি সঞ্চারের পরিবর্তে তিনি হিন্দুধর্মে শক্তি সঞ্চার করতে চাইলেন। ফলে অনেক অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান আর সংস্কার শক্তিমান হয়ে উঠল। যেমন ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিকতা, রামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব ইত্যাদি। বিবেকানন্দের অনেক বাণীতেই এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের, উৎকৃষ্ট চিন্তার সঙ্গে অসার্থক চিন্তার মিশ্রণ লক্ষিত হয়। যথা—

১. ধর্মের কাজ আত্মার সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে নয়। অথচ তিনি অস্পৃশ্যতা এবং মাদ্রাজের ব্রাহ্মণদের জাতি অভিমানকে আঘাত করে কথা বলেছেন। সম্ভবত এ কারণে নারীদের সমস্যা নিয়ে তিনি কিছু বলেননি।

২. তিনি বলেছেন আমেরিকার আধ্যাত্মিক জীবন অনুন্নত কিন্তু সমাজ উন্নত। আধ্যাত্মিকতায় ঘাটতি থাকলে সমাজ উন্নত হয় কেমন করে—তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। আচার-অনুষ্ঠান পালন যে আধ্যাত্মিকতা নয় তা তিনি জানতেন। অথচ ভারতের আধ্যাত্মিকতা বলতে মূলত আচার-অনুষ্ঠানই বোঝায়।

৩. বেদকে তিনি অপরিবর্তনীয় বলেছেন—অথচ তাঁর বিশ্বাস ছিল না এই মতে। এ মত অনেকটা আর্যসমাজ-সদৃশ মত—যা বাংলাদেশ সমর্থন করেনি। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলেননি। রামকৃষ্ণদেবও শাস্ত্রের পরিবর্তে ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্ত হবার কথা বলেছেন।

৪. শক্তিমানের মতো অন্যায় কর্ম করাকে তিনি সমর্থন করেছেন। অথচ দুই বিশ্বযুদ্ধের পরে এ মতের ভ্রান্তি প্রমাণিত। সম্ভবত জাতীয়তার প্রকাশই তাঁকে বিভ্রান্ত করেছিল।

৫. তাঁর সবচেয়ে দুর্বল চিন্তা এই যে আধ্যাত্মিক দেশ ভারত হবে জড়বাদী দেশ ইউরোপের আচার্য। দুই সভ্যতার এই তুলনা যথাযথ নয়। কারণ সভ্যতা মাত্রেই আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের মিশ্রণ। হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান—সব ধর্মেই একই সঙ্গে মহৎ ও দুর্বৃত্তের জন্ম হয়েছে। আসলে সেই সময়ের ইউরোপের ব্যাপ্ত প্রাধান্যের সামনে বাঙালির নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা এভাবেই নিজের অস্তিত্বকে শক্তিমান করে তুলতে চেয়েছিল।

চিন্তানায়ক নয়, মানবপ্রেমিক বিশেষত দেশপ্রেমিক রূপটিই বিবেকানন্দের প্রকৃত রূপ। আপন অন্তরের প্রবল শক্তি তিনি দেশ ও মানুষের সেবায় নিয়োগ করেন। তাঁর মানবপ্রেমের অকৃত্রিম বলিষ্ঠতার প্রমাণ কলকাতায় প্লেগের সময় তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের জন্য কেনা জমি বিক্রয় করে জনসেবার অর্থ সংগ্রহের জন্য সশিষ্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বার বার বলেছেন অন্যের জন্য বুদ্ধের মতো শত সহস্রবার জীবন ত্যাগ করা উচিত।

বিবেকানন্দের এই প্রেমের সাধনা হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও পরমহংসদেবের অসম্পূর্ণ ভগবৎ সাধনাকে করে তোলে শক্তিমান। অবশ্য রামকৃষ্ণদেবের সাধনায় সেবা-প্রবণতা না থাকলে তিনি স্বামীজিকে নিজের মুক্তি উপেক্ষা করে লোকহিত সাধনায় প্রাণিত করতে পারতেন না। তাই তাঁর ঈশ্বরসাধনা অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আবার বিবেকানন্দের প্রতিভার সঙ্গো যুক্ত না হলে রামকৃষ্ণদেবের মানবসেবা-কামনা সফল হত না। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের অনেককে মানবসেবায় প্রাণিত করেন। পরমহংসদেবের সাধনা ছিল সেবাধর্মী, একান্ত আত্মসম্পূর্ণ নয়। এজন্য তাঁর প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের ত্যাগের সাধনা সার্থক হতে পেরেছে।

হিন্দু জাতীয়তার সাধনা স্বামীজির প্রেমের সাধনা থেকে প্রবল শক্তি লাভ করলেও তা ছিল সাময়িক। কারণ জাতীয়তাবাদ আর প্রেমের সাধনা—উভয়ের প্রকৃতি পরস্পরের বিপরীত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সত্যবিমুখ, অহং প্রধান এবং নিষ্ফল। প্রেমের সাধনা তা নয়।

তবে পরমহংসদেবের আত্মসম্পূর্ণ ভগবৎ-সাধনা এবং বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণ—উভয়ের প্রভাব জাতীয় জীবনে অবাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ এই প্রবণতাসমূহ জীবনবিমুখ।

পরমহংসদেবের ঈশ্বরানুরক্তি ও নির্ভরতা এবং বিবেকানন্দের দুঃস্থ আর নির্যাতিতদের প্রতি সহানুভূতি জীবনবিমুখ নয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য, মরমিবাদ, সন্ন্যাস-প্রীতি বর্তমান। এই সব জীবনবিমুখ প্রবণতা থেকে এ দুই সাধনাকে পৃথক করে দেখা সম্ভব কিনা—এর উপরই নির্ভর করছে জাতীয় জীবনকে তাঁদের সাধনা কোনো মহত্তর পরিণতির দিকে চালিত করবে না এ বিষয়ে ব্যর্থ ও বিপত্তিকর রূপে পরিগণিত হবে—এ প্রশ্নের উত্তর।

ষষ্ঠ তথা শেষ অধ্যায়ে উনিশ শতকের রেনেসাঁস বিশ শতকের প্রথম ভাগে কীরূপ গ্রহণ করল এবং ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হল তারই ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে। এ অংশে স্বদেশি আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ এবং মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারভিত্তিক রূপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস-এর ফসল বিশ শতকের প্রথমার্ধের স্বদেশি আন্দোলন—যা বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক চেতনাকে পুষ্ট করেছিল। উনিশ শতকের বাংলায় প্রবল হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। একই সঙ্গো গড়ে ওঠে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেসের উৎস 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। এই দুই সংগঠনের সঙ্গো হিন্দু জাতীয়তাবাদের যোগ না থাকলেও দুটিই ছিল বেশ শক্তিশালী। কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের বক্তৃতাসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হন বিবেকানন্দ এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শাসকদের নিকটে গুরুত্ব পায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মতো জনপ্রিয় না হলেও দেশের উপর এদের প্রভাব কম ছিল না।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না এর সমর্থকদের মনে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ (ওদুদের মতে মন্থরগতি ব্রাহ্মগণ), বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অনুরাগী কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর অনুগামীগণ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস-বিবেকানন্দ ও তাঁদের ভক্তগণ প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মনে ক্রমে যুক্ত হয় বিস্তৃত বিশ্বের উদার

মানসিকতা, গণতন্ত্র আর বিজ্ঞানের আকর্ষণ। শেষ দিকে বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের একাংশ যোগ ও সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হয়। তবে তার চেয়ে ব্যাপ্তভাবে দেখা দেয় হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আপাত শক্তিশালী আসলে দুর্বল গৌরববোধ। স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব শক্তি এই ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গৌরববোধকে পুষ্ট করেনি। কারণ তাঁর শক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল সন্ন্যাসপ্রীতির মতো জীবনবিমুখতা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা। ফলে অসাধারণ ব্যাপ্তি সত্ত্বেও হিন্দু জাতীয়তাবাদ ছিল লক্ষ্যহীন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে আফ্রিকায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক ও ইংরেজদের শুরু হয় বোয়ার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয় আদর্শকে যথার্থ লক্ষ্যের সন্ধান দান।

বাংলার উপর ইউরোপের প্রবল প্রভাব বহুদিন ধরেই কমে আসছিল। এ প্রভাব বোয়ার যুদ্ধের ফলে নিঃশেষে মুছে গেল। কারণ এই যুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার স্বার্থপরতা আর দায়িত্বহীনতার নগ্ন রূপ উদ্ঘাটিত হয়। পরিণামে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আরও শক্তিমান হল এবং এ দলের মধ্যে আবির্ভূত হলেন ক্ষুদ্র হলেও বিশিষ্ট একদল সাধক। পূর্ববর্তী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এ ধরনের সাধক। কারণ তাঁদের কাছে হিন্দুত্ব ছিল এক ধরনের আত্মিক চেতনা আর সে চেতনা দ্বারা প্রভাবিত জীবনাদর্শ। কিন্তু এঁদের ত্রুটি এই যে ইউরোপের সাধনার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা না করেই তাঁরা করেছিলেন সমালোচনা। অর্থাৎ সত্যানুরাগ অপেক্ষা স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি তাঁদের কাছে বড়ো ছিল। কিন্তু বিশ শতকের এই তাপস গোষ্ঠী (যাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী অরবিন্দ, সিস্টার নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ) পূর্বজদের ত্রুটি থেকে অনেকটা মুক্ত ছিলেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদ সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে চেতনাকে ছাড়িয়ে যায়নি। হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য দিয়ে দেশবাসীদের তাঁরা মাতাতে চাননি। তাঁদের কাম্য ছিল ইউরোপ অপেক্ষা মহৎ ও কার্যকর লক্ষ্য দ্বারা দেশের মানুষের কর্মশক্তিকে সক্রিয় করা। এ সময়ের অন্যান্য নেতা অপেক্ষা এঁদের আর্বিভাব ছিল অর্থপূর্ণ। কেন না হিন্দু জাতীয়তাবাদকে তাঁরা পরিচ্ছন্ন, জীবনধর্মী ও বলিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে শ্রদ্ধেয় মনীষী শ্রী অরবিন্দের প্রধান মত ছিল আপনার অন্তরস্থ দিব্য জীবনের সম্যক প্রকাশেই মানবজীবন হয় সার্থক। এ চিন্তা এক হিসেবে জগতের সব মহাপুরুষের প্রধান চিন্তা। স্বামী বিবেকানন্দের সোহম্‌বাদও একই কথা বলে। তবে শ্রী অববিন্দের বিশিষ্টতা এই যে, কেবল ব্যক্তিজীবনে নয় সমষ্টিজীবনেও দিব্যজীবনের বিকাশ ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তবে এ বিষয়ে আলোচনার উপযোগী নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে তাঁর বক্তব্য ছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়; জগতের অতুল্য সম্পদ ভারতীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধির অধিকারী হওয়ার জন্য ভারতের বিশিষ্ট জীবনাদর্শ সম্পর্কে সচেতন থেকে স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত সংগ্রামই এখন কর্তব্য। কারণ স্বাধীনতা ভিন্ন সে জীবনাদর্শ ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অধিকার লাভ অসম্ভব। শ্রী অরবিন্দের অন্যতম কীর্তি 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষির মর্যাদা দান। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি অজানা। তবে তাঁর বাণী তৎকালীন বাঙালির রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্দীপিত করেছিল। ভারতের আত্মিক চেতনার প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা।

বিবেকানন্দ-শিষ্য সিস্টার নিবেদিতার মধ্যে গুরুর ধর্মাদর্শের সঙ্গে মিশেছিল মজ্জাগত ব্যক্তিজীবনের মর্যাদাবোধ। ভারতীয়দের তিনি দুর্বলতামুক্ত ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। অনেকের মতে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সে কথা সত্য কিনা বলা যায় না। তবে ভারতীয়দের ইউরোপ-ভীতি দূর করার চেষ্টা তিনি করতেন। শ্রী অরবিন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা কিন্তু বেশিদিন জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পক্ষান্তরে জাতীয় জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রত্যক্ষ যোগ বহুদিন বজায় ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, ব্রাহ্ম সাধনার

উত্তরাধিকার—সব কিছুর মধ্যে দিয়ে বিকশিত তাঁর চিত্ত বিরাট, বিচিত্র ভারতবর্ষের সার্থকতার পথ সন্ধান রূপ মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। বাংলার উনিশ শতকের রেনেসাঁস তাঁর মধ্যে পেয়েছিল অসাধারণ সার্থকতা; গড়ে উঠেছিল বিশ শতকের বাংলার অমূল্য ভাবসম্পদ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ বাল্যে দেখেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম বিভাগ আর হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান। তাঁর কৈশোরে বাংলা সাহিত্যের যৌবনদাতা 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাব।

দেবেন্দ্রনাথ মতবিরোধ সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। কিন্তু তাঁর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের কটাক্ষ করে রচনা করেন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামের প্রহসন। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য নেতাদের মধ্যেও ছিল এই আঘাতপ্রবণতা।

বাল্য থেকে কাব্যের একান্ত অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিত্যসঙ্গী ছিলেন জয়দেব, বৈষ্ণব পদাবলির কবিগণ, কালিদাস, বায়রন, শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস, ব্রাউনিং। গভীর অনুভবের সহজ ভাষারূপ দানে সক্ষম বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) কবিতাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তথাপি পরিবেশ জনিত কারণে ব্রাহ্ম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল; চব্বিশ বছর বয়সে (১২৯১ বঙ্গাব্দে) লেখা 'রামমোহন রায়' নামের দীর্ঘ প্রবন্ধে (যা পুস্তিকা হিসেবে বের হলেও পরে আর মুদ্রিত হয়নি। এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ 'চারিত্রপূজা'-য় বের হয় এবং পরে সেটি বর্জিত হয়) আছে তার পরিচয়। এ প্রবন্ধে তরুণ রবীন্দ্রনাথ হিন্দু জাতীয়তাবাদের একান্ত সমর্থক। কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুরাগীদের খ্রিস্ট ভক্তিতে অস্বস্তি বোধ করে 'ব্রাহ্ম সম্মিলন সভায়' প্রদত্ত এক বক্তৃতায় জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেছিলেন তিনি—'আপন দেশীয় ভাবে প্রতি দেশের লোককে ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিতে এ মনোভাব আরও তীব্র—"ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ব্রহ্ম।...ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোনো নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না।"

প্রকৃতপক্ষে একালের বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথের মনে তখনও প্রকৃত ধর্মবোধ জাগেনি। দেবেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ঊর্ধ্বে ধর্মকে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম জাতীয়তার অঙ্গ। অর্থাৎ এ সময় জাতীয়তাই তাঁর কাছে ধর্ম। এর নয় বছর পরে রবীন্দ্র মানসে প্রকৃত ধর্মবোধের উন্মেষ হয়। তারই প্রকাশ রূপ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে রচিত 'এবার ফিরাও মোরে'। কবিতাটিতে দেখি গভীর ঈশ্বরবোধ ও মানব-দুঃখসুখের সঙ্গে নিবিড় যোগই তাঁর কাছে ধর্ম হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। মোটামুটি ১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০৯ বঙ্গাব্দ—এই সময়পর্বে রচিত 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা'য় এই ধর্মবোধের প্রকাশ লক্ষিত হয়।

আদি ব্রাহ্ম সমাজে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতি ছিল; কিন্তু সে সম্বন্ধে তীব্র বেদনাবোধ ছিল না। আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হলেও এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে সমাজের প্রভেদ। এ সময়ের শেষ দিকে রচিত রবীন্দ্র-প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় কবির স্বদেশপ্রীতির প্রবলতার প্রকাশ। দেশীয়দের প্রতি শাসকবর্গের অবজ্ঞা, অবিচার, হিন্দু সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত্ব, এ বিষয়ে ইউরোপ ও ভারতের প্রভেদ, ইউরোপীয় 'নেশন' ও ভারতীয় 'সমাজ'— উভয়ের পার্থক্য, ভারতীয়দের আত্মচেতনা উদ্রেকের উপায়—এসবই এ সময়ের প্রবন্ধসমূহে আলোচিত হয়েছে।

এ সময়ের মধ্যভাগে বোয়ার যুদ্ধ কালে শক্তিমান ও সম্মানিত ইউরোপের দুর্বলতার অনাবৃত প্রকাশ দেখে বেদনার্ত হন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন আশ্রয় খুঁজে পায় ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত অপ্রমত্ত, লোভহীন শান্তির

আদর্শে—'নৈবেদ্য'-র কিছু কবিতায় আছে তার প্রকাশ। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে আশা-ভরসা এ সময় তাঁর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়। আর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। তাই ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে ছাত্রদের নির্জনে পবিত্রভাবে বড়ো করার কথা তিনি জানিয়েছেন ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লেখা এক চিঠিতে।

নিরাকার পরম ব্রহ্মের সাধনা গ্রহণ করলেও ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কার প্রয়াসের বদলে চিন্তায়, আচরণে আর সমাজে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে প্রাচীন ভারতের আদর্শ স্থাপন করতে চাইলেন তিনি। তাঁর মতে ব্রাহ্মণগণ হিন্দু এবং হিন্দু সমাজ দ্বিজ সমাজ। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি উপজাতি ভিন্ন কায়স্থ সুবর্ণবণিক সবাই দ্বিজ। ব্রাহ্মণগণ ত্যাগ, চারিত্রিক শুচিতা এবং জ্ঞান সাধনার জন্য হবেন এ সমাজের প্রধান; ভারতবর্ষকে তাঁরাই করবেন ঐক্যবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত এই নব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে সৃষ্টি করল নানা সমস্যা। তিনি যখন ধর্মবোধ আর জাতীয়তাবোধের মধ্যে সংযোগের পথ খুঁজছেন তখন ব্রিটিশ শাসক বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম—এ দুটি ভাগে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করল। বিহার ওড়িশা ও আসাম তখন বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্থির হল আসাম, ঢাকা, রাজশাহি নিয়ে গঠিত হবে বাংলার পূর্বভাগ; পশ্চিম ভাগে থাকবে বাংলার প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ এবং ওড়িশা ও বিহার। বলা হল যে শাসনের সুবিধা ও পূর্ব বঙ্গের উন্নতি এ বিভাগের উদ্দেশ্য। শিক্ষিত বাঙালি সমাজ কিন্তু বুঝল তাদের দুর্বল করাই শাসকপক্ষের লক্ষ্য। প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সারা বাংলা। এমন প্রাণপূর্ণ বিশাল প্রতিবাদ ইংরেজ শাসনাধীন বাংলায় আর দেখা যায়নি। বাঙালি জাতির প্রাণশক্তির এ প্রকাশে নেতাগণ হলেন আশান্বিত ও উদ্দীপ্ত; শাসকপক্ষ হলেন ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত।

এই প্রতিবাদে প্রথমে কোনো সাম্প্রদায়িক অনৈক্য না থাকায় শাসকগণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শীঘ্রই সম্প্রদায়গত ভেদ দেখা দিয়েছিল। তথাপি এই স্বতঃস্ফূর্ত নিরস্ত্র প্রতিবাদ, জনতা ও ছাত্রদের পুলিশি নিপীড়ন সহ্য করার ধৈর্য দেশকে চমকিত করে নতুন সংকল্পের শক্তি জোগাল। এশিয়ার জাগরণের এই বার্তা ছড়িয়ে গেল দূর দূরান্তে।

আবেদন-নিবেদন নিয়ে শুরু হয় কংগ্রেসের যাত্রা। অথচ কংগ্রেস ছিল দেশের অভিযোগ জানাবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তাই শীঘ্রই তার আবেদন-নিবেদন হয়ে উঠল সুস্পষ্ট সমালোচনা আর দাবি। ক্রমে এর সুর চড়ল; দাবি বাড়তে লাগল। ফলে শাসক দলের প্রাথমিক প্রশ্রয়, বিরক্তি ও অবজ্ঞা থেকে ক্রমে পরিণত হল ক্রোধে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে প্লেগ প্রতিরোধে নিযুক্ত ইংরেজ সৈন্যদলের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ জনতা হত্যা করে দুই সৈনিককে। ফলে জনতার উপর চলে নির্মম অত্যাচার। মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকায় করেন প্রবল প্রতিবাদ। তিনি নাকি প্রথম শিবাজির হিন্দু রাজ্য স্থাপন প্রয়াসের প্রশংসা করেন। এর কিছু আগে মহারাষ্ট্রে দেখা দিয়েছিল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। ক্রমে মহারাষ্ট্রে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও জাতীয় সংহতির আন্দোলন প্রবল হয়। তারই পরিণামে শুরু হয় শিবাজি উৎসব (১৮৯৭)। প্রসিদ্ধ 'দেশের কথা'-র লেখক সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রয়াসে বাংলায়ও আরম্ভ হয় এ উৎসব। তাঁরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি যা পরে তিনি প্রায় বর্জন করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদকে শিবাজি উৎসব করে তোলে আরও শক্তিমান। কংগ্রেসে দেখা দেয় 'গরম' দল। এ আন্দোলন বাংলার স্বদেশি আন্দালনকে করে তোলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সমকালের বাংলা নাটকগুলিতে দেখা যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের আবেগ।

স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার উদ্দীপনাকে প্রকৃত জাতি গঠনের কাজে ব্যবহারের কথা ভেবেছিলেন কোনো কোনো নেতা। তাঁদের দৃষ্টি পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা, পণ্য উৎপাদন, গ্রামে ব্যয়বাহুল্য বর্জিত বিচার ব্যবস্থা—এসবের উপর দেশীয়দের কর্তৃত্ব করার সম্ভাবনার দিকে। কিছুকাল আগে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশালে এরূপ কাজ আরম্ভ

করেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বিশ শতকের কলকাতার কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে এ কাজ শুরু করেছিলেন 'ডন' সোসাইটি পরিচালক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একই ভাবনা থেকে ১৩১১ বঙ্গাব্দে লেখা হয় রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ'। এ সময়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আবদুর রসুল ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। এ সময়ে অধ্যাপক সিলি ও পার্লামেন্ট সভ্য মাইকেল ডেভিড উভয়ের একটি করে উক্তি প্রসিদ্ধি অর্জন করে। প্রথম উক্তি সিলি-র—"If at any time the Indian people became practically of one mind not to help our administration we shall have to quit that moment that country at once." দ্বিতীয় উক্তি মাইকেল ডেভিড-এর "Loyalty can only be honestly felt and expressed when it is honestly earned by the ruling power."

প্রথম উক্তি নেতাদের দেয় প্রবল প্রতিরোধ গঠনের প্রেরণা; দ্বিতীয়টি রাজভক্তির দায় থেকে শাসিতদের দেয় মুক্তি। এ সময়ের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। তবে চিন্তা ও ভাষার তীক্ষ্ণতা আর তীব্রতা লক্ষিত হল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের লেখায় ও বক্তৃতায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে হন রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান। তাঁর লেখায় থাকত তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা। বিপিন্দ্রচন্দ্র পালের রচনায় থাকত তত্ত্বচিন্তা। তাই তিনি সাধারণ মানুষ বিশেষত তরুণদের অধিক প্রভাবিত করেন। তিনি বলতেন সর্বশক্তি প্রয়োগে স্বাধীনতার চেতনা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ক্রমাগত বয়কট প্রভৃতি দ্বারা শাসনকার্যকে বিঘ্নিত করাই দেশবাসীর কাজ। কাপড়, নুন ও সরকারি অফিস পুরোপুরি বয়কট করলে শাসকদল সমস্যায় পড়বে। ইংরেজ-পণ্য বয়কট নীতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলে গঠনপন্থীরা কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই কিছুটা কাজ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বয়কট সমর্থন করেননি। সারা দেশে এ নীতি অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে ছিল। তাই তিনি ভাবলেন ইংরেজ বিদ্বেষ নয়, গভীর দেশপ্রীতিই মানুষকে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারে প্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারে স্বদেশ-চেতনা জাগ্রত হয়েছিল বহু আগেই। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে তার উল্লেখ। দেশে সে প্রেরণা জাগেনি বলেই তাঁদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এবার রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায় বা পণ্য উৎপাদনে নয় দেশের পূর্ণ সেবার জন্য নিজেদের নিয়োজনের উপর জোর দিলেন। এ সম্বন্ধে বহু কথা তিনি নানা প্রবন্ধে বলেছেন। একটি উদাহরণ "... সর্ব প্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন ... ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনামূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই পথ সহজ শ্রেয়ের পথ নহে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গলকর্মে নিঃশেষে আত্মনিবেদনের আবেদন করলেন, তখনই রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ঘোষণা করলেন বয়কট-এর তীব্রতায় শাসকরা অসুবিধায় পড়বে।

কম শ্রমে কাজ হবে জানলে অধিক শ্রমকে মূর্খতা মনে করাই স্বাভাবিক। উপরন্তু বয়কট-এর মধ্যে আছে তীব্র উন্মাদনা। আর রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় আছে কঠিন শ্রমের অন্তে বিলম্বিত ফল লাভ বা ফল লাভের আশামাত্র। কাজেই বয়কট আন্দোলন হল ব্যাপক। বিলেতি পণ্য বয়কট-এ যারা আপত্তি করল সেই নমঃশূদ্র ও মুসলমানগণের উপর কোথাও কোথাও জোর করা হল। কিছুটা এই জবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের প্রতিক্রিয়ায়; এবং অনেকটা শাসকপক্ষের প্রয়াসে শুরু হল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। নেতাগণের কেউ ইংরেজদের উপর এবং অনেকে মুসলমানদের

উপর ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু সংকট সমাধানের চেষ্টা করলেন না কোনো নেতাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ অসীম ধৈর্যে সংকটের সম্মুখীন হলেন, বললেন—"আগুন যখন আমাদের নিজেদের ঘরে লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উষ্ণ বাক্যের বায়ু বীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না।" ('সফলতার সদুপায়') পাবনা প্রাদেশিক কনফারেন্স-এর অভিভাষণে তিনি প্রস্তাব করলেন "যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।" তিনি পূর্বে বলেছিলেন "একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে।" সব কিছু মিলিয়ে তাঁর এ প্রস্তাবের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করেনি কেউ। বয়কট-এর ব্যাপকতা, পুলিশি নির্যাতন বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক মন কষাকষি, হাঙ্গামা, কংগ্রেসে নরম ও গরম দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, গরম দলের কংগ্রেস ত্যাগ—এসব ঘটনা ঘটেই চলেছিল।

১৯০৮-এর ২৫মে মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ফলে দুই ইংরেজ মহিলার মৃত্যু হয়। এর এক মাসের মধ্যে মানিকতলার পোড়ো বাড়িতে পুলিশ খুঁজে পায় বোমার কারখানা। এ সম্পর্কে অপ্রস্তুত নেতারা কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম হলেন। একমাত্র বাল গঙ্গাধর তিলক নির্ভয়ে নিজের সংবাদপত্রে ঘোষণা করলেন এটি দমননীতির অনিবার্য ফল। রবীন্দ্রনাথ এসময়ে এক সভায় পাঠ করেন 'পথ ও পাথেয়' নামের প্রবন্ধ। তরুণ বিপ্লবীদের জন্য সহানুভূতির সঙ্গে প্রবন্ধটিতে প্রকাশ পেল ভারতবর্ষের সমস্যার জটিলতার অ-সাধারণত্ব, তার সম্মুখীন হতে শিক্ষিত সমাজের অক্ষমতা বা অনিচ্ছা, যুগপ্রবণতা—এ সবের ধীর বিশ্লেষণ এবং সমস্যার সমাধানে তাঁর বিশ্বাসদৃঢ় নির্দেশ। 'সমস্যা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সংকট উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করেছেন। বিচিত্র জাতি, ধর্ম ও আচার সম্পন্ন পুরোনো দেশ ভারতের মূল সমস্যা এবং তার প্রতিকারের প্রত্যয়-সমৃদ্ধ স্পষ্ট নির্দেশ যেমনভাবে এ দুটি প্রবন্ধে পাওয়া যায় তা রবীন্দ্র-রচনায়ও বিরল।

রবীন্দ্রনাথের মতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহায়তার অভাব এবং উদাসীনতাই এ দেশের মূল ত্রুটি। এই উদাসীন অবজ্ঞা মুছে না গেলে দেশবাসীর মনুষ্যত্ব বিকশিত হবে না। —"সেই নির্ভীক বিরাট বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সহিত পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনো মতেই বড়ো হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে যে-কেহ আসিয়াছে সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্ব মানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় ধর্মে আচরণে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—এই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা, উচ্চ নীচ আত্মীয় পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া।"

দেশের এই মহাসংকট ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের মন মুক্ত হল হিন্দুত্বের জন্য অবুঝ মমতা থেকে। দেশের দুর্গতি, অসম্পূর্ণতার মর্ম অনুধাবন করে আশ্চর্য বিশ্বাসে তিনি কল্যাণপথের নির্দেশ দিতে পারলেন, দিলেন আধুনিক পৃথিবীর প্রকৃত মঙ্গল-পন্থার নির্দেশ। বিশ শতকের সূচনায় চিন্তা আর অনুভব—উনিশ শতকের রেনেশাঁস-এর এ এক অবিস্মরণীয় সার্থকতা। কিন্তু দেশবাসী রবীন্দ্র-নির্দেশের মর্ম বুঝল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল ধর্মচেতনা অর্থাৎ জগতের সঙ্গে প্রেম ও শুভবোধ জনিত যোগের স্তরে; দেশের মানুষের অবস্থান ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের স্তরে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার প্রথম স্তরে জাতীয়তাবোধ ছিল। কিন্তু ক্রমে বৃদ্ধি পায় তাঁর সত্যাশ্রয় ও প্রেমপ্রীতি এবং শুদ্ধ হয় তাঁর জাতীয়তাবোধ।

উনিশ শতকের শেষে বাংলার জাতীয়তাবোধ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরোধ আর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব পাশ্চাত্যে বিস্তৃত হওয়ায় বৃদ্ধি পায়। বিবেকানন্দের সাধনায় জাতীয় গৌরববোধ অপেক্ষা মূল্যবান যা কিছু ছিল তা ঐতিহ্য-গৌরব বোধের মধ্যে লুপ্ত হল। কারণ উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সচেতন প্রয়াস তাঁর মধ্যে ছিল না।

স্বদেশি আন্দোলনের সূচনায় জাতীয়তাবোধ ছিল উদার, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল এ আন্দোলনের। বিশ শতকের সূচনায়ও তা সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বাঙালি মুসলমানদের ছোটো এক যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর উপর পড়েছিল তার প্রভাব। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র আর 'শিবাজি উৎসব' জনিত সংযোগের বৃদ্ধি কিছু ছিদ্রান্বেষী মুসলমানকে জাতীয়তাবোধের বিরোধী করে তোলার সুযোগ দিয়েছিল। কারণ 'বন্দেমাতরম্'-এর উৎস 'আনন্দমঠ'—যার বিষয় মুসলিম শাসন বিনাশ পূর্বক হিন্দু শাসন স্থাপন প্রয়াস আর শিবাজি স্মরণীয় মোগল শাসন বিপর্যস্ত করে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। বিপিনচন্দ্র পাল অবশ্য বলেন আন্দোলন গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রতীক হিসেবে শিবাজি গৃহীত হয়েছেন। এর দ্বারা মুসলমানদের আঘাত করা হয়নি। মুসলিমগণ আকবর উৎসব করলে হিন্দুরা খুশি হবেন। কিন্তু শিবাজির সঙ্গে যোগ নিষ্ঠাবান মুসলমান সম্রাট আওরঙ্গজেবের। ফলত বলা যায় উনিশ শতকের শেষে এ দুই কারণে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিল সাম্প্রদায়িকতা; শাসকশক্তি তা প্রয়োগ করল হিন্দু জাগরণের বিরুদ্ধে। এ প্রয়াসের বিষাক্ত ভাবী সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিল না পশ্চাৎপদ এবং সে কারণে স্বস্তিহীন মুসলমান সমাজ। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোহকর প্রভাব হিন্দুদেরও এ সম্পর্কে সতর্ক হতে দেয়নি। সমকালের বিশ্বে জাতীয়তাবোধ জনিত মুগ্ধতা আর হিন্দুদের উন্নত অবস্থা—উভয়ের ফলে শক্তিমান হল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ভারতের মতো বহু ধর্ম আর ভাষার দেশে কোনো সম্প্রদায়কেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধ যথার্থ জাতীয় আদর্শ নয়। এ বিষয়ে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম যুগে সচেতনতা সম্ভব নয়। স্বদেশি আন্দোলনকালে সাম্প্রদায়িক সংঘাত যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখনও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য সবাই ছিলেন এ বিষয়ে অচেতন। অথচ এ কারণেই রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন নেতারা মনে করেছিলেন স্বপ্নদর্শী।

শাসকগোষ্ঠীর উৎকট অহংকার, প্রবল অত্যাচার, হিন্দু তরুণদের প্রাণপণ প্রতিশোধ প্রয়াস, নেতৃবর্গের দুর্বলতা, সাম্প্রদায়িকদের ভীতিজনিত কাণ্ডজ্ঞানহীনতা—সব কিছু মিলে ধ্বংস করে দিল বাংলার রেনেসাঁসজাত মানবমহিমা বোধ আর উদার জ্ঞান-বিজ্ঞানমনস্কতা। স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন দিলেন গঠনমূলক কাজে—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তার সঙ্গে চলল সাহিত্যচর্চা। বহু প্রিয়জনের মৃত্যুর আঘাত, ব্যাধি, মানসিক অস্বস্তি—এসবের ফলে তাঁর মনে ধ্বনিত হল আপন অন্তরদেবতার কাছে একান্ত আত্মনিবেদনের সুর। এই নিবেদন তাঁকে ফিরিয়ে দিল মনের শান্তি আর দেহের স্বাস্থ্য। ক্রমে তিনি লাভ করলেন বৃহত্তর জগতের সমাদর। দেশবাসীর কাছে তাঁর যে আহ্বান ব্যর্থ হয়েছিল বিশ্বের কাছে তিনি সেই অহম্ বর্জিত প্রেম, সেবা ও মৈত্রীর আদর্শ উপস্থাপিত করলেন তিনি। দেশের বহু বিচক্ষণ নেতৃবর্গ বিশ্বাস করেননি তাঁর উপদেশসমূহ। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা-সূত্রে রবীন্দ্র-বাণীর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। এ প্রবন্ধ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধিজির শান্তি ও মৈত্রীর বাণী বিশ্বের বহু অধিবাসীকে আকৃষ্ট করে। বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে উৎসাহীদের পক্ষে এ এক আনন্দ-সংবাদ। কারণ সেই জাগরণ মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতাগণ উদার জ্ঞানসাধনা, শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর কথা প্রচার করেছিলেন শতাধিক বৎসর পূর্বে। শান্তি ও অহিংসার প্রচারক হিসেবে গান্ধিজির মর্যাদা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু বাংলার রেনেসাঁস-এর শ্রেষ্ঠ নেতা রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বোধ গান্ধিজি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের।

গান্ধিজির মনে দীর্ঘকাল ছিল সনাতনী হিন্দু ও সনাতনী মুসলমানের মিলনের আশা। নিজেকে তিনি বলতেন

সনাতনী হিন্দু। ১৯৪৪-এ অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনকালে তাই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় কেন তিনি 'মনুসংহিতা' সমর্থিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। প্রাচীন হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ ও নারীর একাধিক পতিগ্রহণ বর্তমানে পরিত্যক্ত—উত্তরে এ উদাহরণ দিয়ে গান্ধিজি বলেন ধর্মশাস্ত্র ধর্ম নয়—চিরন্তন মানববিবেকই ধর্ম—'Religion is eternal human conscience'। এ সিদ্ধান্ত তাঁকে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস-নেতাদের পর্যায়ভুক্ত করে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় বাংলার জাগরণের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সিদ্ধান্ত আধুনিক কালেরও এক মূল্যবান সিদ্ধান্ত।

বোমাকেন্দ্রিক স্বদেশি আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনে সৃষ্টি করল সংকট। বাংলার শ্রেষ্ঠ তরুণগণ বেছে নিল সন্ত্রাসবাদের পথ। রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রভাবিত করতে পারলেন না। শাসকদলের দমননীতি হল কঠোর। এই ধ্বংসাত্মক মানসিকতা ও কর্মপ্রণালী পরিবর্তিত হল গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের ফলে।

স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের বহু দুর্বলতা থেকে মুক্ত গান্ধিজি জোর দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও অহিংসার উপর। জীবনপণ করে অহিংসা অবলম্বনের নীতি—বাঙালি সহজেই গ্রহণ করল কারণ প্রাণ পণ করে দুঃসাধ্য সংগ্রামের আনন্দস্বাদ তার জানা ছিল। অসহযোগ আন্দোলন বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের মতো ব্যাপ্ত না হলেও হয়েছিল আন্তরিক। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বহু বাঙালি এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসাধারণ প্রাণশক্তির পরিচয় দেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে বাংলা ও বাংলার বাইরের দুঃসাহসী তরুণরা আবার সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করে। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপক প্রতিরোধ ছিল সশস্ত্র। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ এ পন্থার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ক্ষতিকর সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা মুছে গিয়ে সেখানে ভারতীয়গণ গড়ে তুলেছিল আশ্চর্য সংহতি। তবে যুদ্ধের উত্তেজনায় আত্মস্বার্থ সহজে লুপ্ত হয়; প্রাত্যহিক জীবনে তা ঘটানো কঠিন। মহাত্মা গান্ধির আন্দোলনও সূচনায় প্রায় মুছে দিয়েছিল সম্প্রদায়গত ভেদ। মুসলমানেরা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লির জুমা মসজিদে ইমামের পদে বসিয়ে বক্তৃতা দানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ সংহতি টেকেনি।

রেনেসাঁস-এর পর বাঙালির আশ্চর্য আত্মপ্রকাশ প্রয়াস নানা পথের শেষে গ্রহণ করল সন্ত্রাসবাদের পথ। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ও নির্দেশ, গান্ধিজির অহিংস সংগ্রাম—তাকে প্রভাবিত করতে পারল না। বাঙালির জাগরণ, তার জাতীয়তাবোধ আর রাজনৈতিক সংগ্রামের এ ভ্রান্ত পরিণাম অত্যন্ত দুঃখজনক। তথাপি বিশ শতকের বাঙালির ব্যর্থতার মূল সন্ধানের ইচ্ছা যদি আমাদের মনে জাগে তবে সে দুর্দিন কাটিয়ে ওঠার দিকেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বলা যায়; কারণ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ শক্তি আর দুঃখের কারণ জানা গেলে তা আর ভয়ংকর থাকে না।

বাংলার রেনেসাঁস-এর মুখ্য ধারা জাতীয় জীবনে ব্যাপ্ত উন্নতি লাভের ধারা আরও সংকীর্ণ অর্থে জীবনবোধ আর রাজনীতির ধারায় এ ভাবেই এল বিপর্যয়। অন্য ধারাগুলি এর ফলে প্রভাবিত হলেও ধ্বংস হয়নি। এইসব অপ্রধান ধারার মধ্যে সাহিত্য ও চারুশিল্প অন্যতম।

বাংলার এ সময়ের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনের স্পর্শসঞ্জাত জীবনাগ্রহ, আনন্দ এবং উদ্দীপনা। জীবন সম্বন্ধে এই আনন্দ-কৌতূহল আর উদ্দীপনা নানাভাবে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকাশ লাভ করেছে বলেই এঁরা একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁদের পরে বাংলা সাহিত্য যতটা সুন্দর হয়েছে ততটা মহৎ হয়নি। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আবেগ ও পৌরুষের ভাষারূপ, রবীন্দ্রনাথের তুল্য ধর্মবোধ তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ এবং আনুষঙ্গিক আনন্দবোধ—এ সবের প্রকাশ বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এ সাহিত্যে আছে জীবনের ছোটো ছোটো দুঃখ-বেদনার ছবি। সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ। বাঙালির বর্তমান দুলর্ভ মানস-সম্পদহীন

জীবনে এইসব দুঃখ কথাও মূল্যহীন নয়। কিন্তু সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিফলন নয়—জীবনের মহৎ স্বপ্নেরও প্রতিফলন। তার অভাবে সাহিত্য জাতিকে দিতে পারে না যথার্থ আনন্দ—যা আসলে শক্তির নামান্তর। সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে জীবনের এই রমণীয়তার রূপায়ণ বাঙালিকে তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের দুঃখ অনেকটাই ভুলিয়ে দিয়েছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালির হীন অবস্থার কথা বলেছেন বহু দূরদর্শী ব্যক্তি। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বাঙালি ব্যবসায়ে কৃতী হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সফল হয়নি।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালি অর্জন করেছিল সফলতা। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সাধনা সম্পর্কে গবেষণা একালের বাঙালির স্মরণীয় কাজ। কাজী আবদুল ওদুদের মতে এই প্রবন্ধ রচনাকালে উচ্চ শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা কম না হলেও প্রতিভাবান ও প্রতিষ্ঠিত বাঙালি বেশি নেই।

তবে তার অপরাজেয় মানস শক্তির পরিচয় আছে বিশ শতকের বাঙালির সাহিত্য আর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কর্মে।

বাংলার মুসলমান, বিশেষত সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। উনিশ শতকে ওহাবি চেতনার যে প্রকাশ মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় তার উত্তরাধিকার লক্ষিত হয় বিশ শতকের মুসলিম রাজনীতিতে। তথাপি বিশ শতকের সূচনায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উদার মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুদ্র এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেখা মেলে। সম্ভবত বাংলার উদার মানবিক আবহ (যার উৎস ইংরেজি সাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্য) আর স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম দিকের শক্তিমান জাতীয়তাবোধ তাঁদের প্রাণিত করেছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান তিন জন—বেগম রোকেয়া (মিসেস আর. এস. হোসেন নামে পরিচিত), কাজী ইমদাদুল হক এবং লুৎফর রহমান। বেগম রোকেয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মতিচুর' (১৯০৪-১৯০৮)-এ ছোটো ছোটো নিবন্ধে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের ছবি নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে। 'সুলতানা'জ ড্রিম' ('Sulatana's Dream' : ১৯০৪-১৯০৮) নামের ছোটো গ্রন্থটিতে নারীর মুক্তি, কর্মজগতে তার যথার্থ স্থানলাভ ইত্যাদি বিষয়ে আপন আশা তিনি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় কৌতুকার্দ্র চিত্রময় ভাষায় রূপ দিয়েছেন। বাংলার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য ১৯১১-তে তিনি শাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

ইমদাদুল হক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আবদুল্লাহ' (১৯১৮)-তে মুসলিম সমাজের গোঁড়ামির দিকটি চিত্রিত করেছেন। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে প্রীত করেছিল।

লুৎফর রহমানের কবিতা-সংগ্রহ 'প্রকাশ'-এ 'চৈতালি'-র প্রভাব সুস্পষ্ট। স্মাইলস (Smiles)-এর নীতি-উপদেশ পূর্ণ লেখার সঙ্গে কিছু মিল আছে তাঁর 'উন্নত জীবন ও মহৎ জীবন' গ্রন্থের। তবে উচ্চ নৈতিক জীবন গঠনের উপর জোর দিলেও লুৎফর রহমানের লেখায় জীবনবোধ অধিক।

এর পরে আসে কাজী নজরুল ইসলামের নাম। স্বদেশি আন্দোলন বিশেষত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর রচনার প্রধান লক্ষণ বলিষ্ঠতা আর শঙ্কাহীন যৌবনের প্রকাশ। স্থির গভীর চিন্তার অভাবই তাঁর রচনার ত্রুটি।

বুদ্ধির মুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৬-এ ঢাকায় গঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এঁদের মুখপত্রের নাম 'শিখা'। 'বুদ্ধির মুক্তি' ('Emancipation of the intellect')-র মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন কামাল আতাতুর্ক, রবীন্দ্রনাথ, 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর লেখক রোমাঁ রোলাঁ, পারসিক কবি সাদী আর হজরত মোহম্মদের কাছ থেকে। এঁদের অন্যতম পরিচালক

আবুল হুসেন বলেছিলেন হজরত মোহম্মদ-এর বিখ্যাত বাণী 'আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে বিভূষিত হও'-এর অর্থ অনন্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত হওয়া। কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই। সে হতে পারে হজরত মোহম্মদের অপেক্ষাও বড়ো। এ মতের জন্য তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ পূর্ণ উদ্যমে তিন বৎসর কাজ করে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন নজরুল এবং উল্লসিত হয়েছিলেন এর আদর্শে। তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের সব অধিবেশন নিষিদ্ধ হয় কারণ এ সংস্থার মুসলিম ধর্ম বিরোধী কাজ। কিন্তু ইসলাম-বিরোধিতা বলতে যা বোঝায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ তা করেনি। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চর্চার কেন্দ্র। এঁদের এক সভ্য বলেন মহাপুরুষের অনুবর্তিতা মানে বুদ্ধি-বিচার বিসর্জন দিয়ে নত হওয়া নয়; মন, প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে তাঁর সাধনা গ্রহণ করা ও প্রয়োজন হলে তাঁকে অতিক্রম করাই মহাপুরুষের প্রকৃত অনুগামিতা।

সমিতিটি চলে আরও সাত বছর; আর বার্ষিক মুখপত্র বের হয় ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর। দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। শেষ দিকে দেশে সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি অর্থহীন হয়ে যায়। অবশ্য বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাস মুছে যায়নি। পরবর্তীকালে পূর্ব বঙ্গের তরুণ লেখকগণ মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধির মুক্তির পথ। উপরন্তু এঁরা ছিলেন ধর্ম ব্যাপারে উদাসীন, বামপন্থী চিন্তার বাহক এবং স্বদেশপ্রেমিক। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের একটি দলের মধ্যে পরিবর্তন আসে দেশভাগের পরে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ বাংলার জাগরণের স্বল্প পরিসর অথচ বেগবান একটি ধারা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্বল্পকালের জন্য প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এ সমিতি বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল এ সত্যও অবশ্য স্বীকার্য।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে বাংলার রেনেসাঁস বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিপর্যস্ত হয়। তিনি বলেছেন অনেকে বলেন এর বিপরীত কথা। তাঁদের মতে স্বদেশি আন্দোলনের সশস্ত্র রূপটি বাংলার জাগরণের আপাত বিপর্যয়ের প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে বাংলার রেনেসাঁস প্রাদেশিকতা ত্যাগ করে হয়ে উঠেছিল সর্বভারতীয়। মতটি গুরুত্বহীন নয়। কারণ শীঘ্রই সর্বভারতীয় রাজনীতির নিয়ামক হলেন মহাত্মা গান্ধি। ব্যাপ্ত নতুন ধর্মচেতনাই বাংলা রেনেসাঁস-এর শ্রেষ্ঠ নায়কদের যথার্থ পরিচয়। গান্ধিজির মধ্যে এ ধর্মচেতনার প্রকাশ লক্ষিত হয় এবং তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু ধর্মচেতনা নয়—গান্ধিজির রাজনৈতিক মত ও কর্মপ্রণালীই দেশের চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতা লাভের উপায় হিসেবে কংগ্রেস গ্রহণ করেছে তাঁর অহিংস আন্দোলনের পথ—কিন্তু তাঁর অপূর্ব ধর্মচেতনা দেশকে প্রভাবিত করেনি। কারণ গান্ধিজির চিন্তাধারায় ছিল জটিলতা। দীর্ঘ সময় তাঁর সত্যপ্রীতি, মানব প্রেম, জীবপ্রেম—যুক্ত ছিল পুনরুজ্জীবনবাদী (Revivalism) চিন্তার সঙ্গে, পরে এ জটিলতা থেকে মুক্ত হয় তাঁর চিন্তাধারা। কিন্তু তাঁর এই অর্থপূর্ণ জীবনসাধন দেশবাসীকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

বাংলার রেনেসাঁস-এর প্রধান নেতারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা কামনা করলেও ধর্মজীবনকে দিয়েছিলেন গুরুত্ব। ধর্মজীবন বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্‌বোধন। তাঁরা অধ্যাত্মবাদ অপেক্ষা বিচারবাদ ও লোককল্যাণকেই কাম্য মনে করেছিলেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁদের মরমি বা আধ্যাত্মিক চেতনা। তাই তাঁদের ধর্মবোধ হয়ে উঠেছিল অর্থপূর্ণ এবং জীবন-জিজ্ঞাসার ভিত্তি।

রেনেসাঁস সময়ের এবং বিশ শতকের জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সত্ত্বেও অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত আমরা পরে বুঝেছি স্বাধীনতা অপেক্ষা মূল্যবান বা তুল্যমূল্য এমন সম্পদ আছে যার অভাবে স্বাধীনতা অর্থহীন।

বিশ শতকে বাংলার বুদ্ধিজীবীগণ আকৃষ্ট হয়েছেন ফ্রয়েড আর মার্কস-এর দর্শনের প্রতি আর সর্ব সাধারণের আকর্ষণের বিষয় রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর সমগোত্রীয় সাধকদের মরমি সাধনা। বাংলার রেনেসাঁস-এর শ্রেষ্ঠ নেতাদের উদার জ্ঞান ও প্রেমের সাধনার তুলনায় এসব মত অসম্পূর্ণ; এদের থেকে কোনো লক্ষণীয় সুফল পাওয়া যায়নি।

তবে মানবজীবন এভাবেই বিচিত্র প্রবণতা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। একথাও সত্য যে মানুষ তখনই যথার্থ সৃষ্টিধর্মী হয় যখন তার ধর্মজীবন—যার অন্য নাম অকপট সত্যাশ্রয়িতা আর জগতের সঙ্গে নিবিড় প্রেমের যোগ তাকে প্রেরণা দেয়। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, প্রবল জাতীয় চেতনা, বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সে প্রেরণা দানের শক্তি নেই।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে আমাদের দেশের তথা আধুনিক কালের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা পরস্পর সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় ধর্মে আচরণে বিচিত্র—নরদেবতা সেই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধির দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা। উচ্চ নীচ সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া।”

এই সংযোগের অভাবেই মূলত বাংলার নব জাগরণ বিপর্যস্ত হয়েছে। নতুন করে তার সঞ্জীবন যদি সম্ভব হয় তাহলে ভারতের স্বাধীনতা হবে সার্থক; বাঙালি ফিরে পাবে তার যথার্থ জ্ঞান। যা জীবনের গভীরতর সত্য, তাকে ধ্বংস করতে পারে না কাল। সত্যাশ্রয়ীর আবির্ভাব হলেই সেই সত্য আবির্ভূত হয়। প্রাচ্যের নব জীবনের জন্যই প্রয়োজন বাংলার রেনেসাঁস-সঞ্জাত নতুন ব্যাপ্ত ধর্মবোধের সঞ্জীবন। কারণ সেটাই আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন।

## ২.৪ বাংলার নব জাগরণ বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদের মতামতের বিশ্লেষণ

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন মুক্তবুদ্ধি, নিরপেক্ষ যুক্তিমনস্ক প্রাবন্ধিক। ‘বাংলার রেনেশাঁস’ শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর এই পক্ষপাতহীন, যুক্তিমনস্ক মুক্ত মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে সাধারণত দুটি মতবাদ লক্ষিত হয়—নেতিবাচক এবং ইতিবাচক। প্রথম মতের চিন্তাবিদগণ বাংলার জাগরণের মূল্য স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় মতাবলম্বীদের বক্তব্য উনিশ শতকে বাংলায় যথার্থই এসেছিল সার্বিক এক জাগরণ। দীর্ঘকালের অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়েছিল দেশ এবং তার কারণ ইংরেজ-শাসন এবং সেই সূত্রে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়। কাজী আবদুল ওদুদ রেনেসাঁস সম্পর্কে এই দ্বিতীয় ইতিবাচক মতের সমর্থক। এবং ‘বাংলার রেনেশাঁস’ শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি তথ্য ও যুক্তি সহায়ে এই ইতিবাচক মতই প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার থেকেই তাঁর এই মতের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যায়। এবং সেই পরিচয় থেকে আমরা আরও প্রাপ্ত হই ওদুদের রেনেসাঁস সম্পর্কিত ইতিবাচক মনোবৃত্তির বেশ কয়েকটি বিশেষত্ব।

প্রথমত তিনি মানসিক উৎকর্ষ তথা চিৎ প্রকর্ষকেই বলেছেন রেনেসাঁস-এর প্রকৃত ভিত্তি। রেনেসাঁস বলতে যে নব জাগরণ বোঝায় তা জাতির ও দেশের চিৎ-সম্পদের জাগরণ। বস্তুগত জাগরণ তার আনুষঙ্গিক ফল—এই মাত্র।

দ্বিতীয়ত এ কারণে তিনি রামমোহন রায়ের কলকাতা-বাস তথা বেদান্ত গ্রন্থের প্রকাশকেই বাংলার জাগরণের সূচনা বলেছেন। কারণ এই সূত্রেই বাঙালির আবদ্ধ সংকীর্ণ ধর্ম ও বাস্তব জীবন নতুন সম্ভাবনার আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রামমোহনের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করে ওদুদ মত প্রকাশ করেছেন রামমোহনের ভাবনার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ বাংলার তৎকালীন সমাজকাঠামো রামমোহনের নব যুগ আনয়নকারী ভাবনার স্বরূপ চিত্তলোকে গ্রহণ করতে পারেনি—কর্মে রূপ দেওয়া দূরের কথা। তিনি আপন নব চিন্তনের যেটুকু রূপ দিতে পেরেছেন তাই যথেষ্ট।

তাঁর মধ্যে পুরোনো আধ্যাত্মিক সাধনা, মধ্যকালীন মানবপ্রীতি আর আধুনিক ইউরোপের বস্তুনিষ্ঠ সাধনার সুসমঞ্জস এবং সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষিত হয়। আর এই বিশিষ্ট সাধনার দ্বারাই তিনি বাংলা রেনেসাঁস-এর বনিয়াদ দৃঢ় করে দিয়েছিলেন।

ডিরোজিয়ো আর ইয়ং বেঙ্গলদের সম্পর্কে ওদুদের মত যে এঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করে রামমোহনের ঈপ্সিত দেশের চিত্তোন্নতির সহায়তা করেছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক অনুরাগ বাংলা সাহিত্যে এনেছিল নতুন প্রাণের ঐশ্বর্য। শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার ব্যাপ্তি, যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার—এই সব কর্মপ্রণালীর মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজ বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল—এ সত্য স্বীকার করেছেন আবদুল ওদুদ। তবে তাঁর মতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের সর্বোত্তম কীর্তি 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-কে ধর্মের মূল বলে ঘোষণা। ওদুদের মতে মানুষের অকৃত্রিম কল্যাণ সন্ধান আর গভীর অনুভবই সত্য উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় এবং যথার্থ ধর্ম। তা ছাড়া মানুষের প্রতি প্রীতি, পরার্থপরতা যা সর্বমানবের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে—বাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষত্ব। এভাবেই ধর্মের কল্যাণময়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ।

কাজী আবদুল ওদুদ এটাও লক্ষ করেছেন যে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে ক্রমে দেখা দিয়েছিল আত্মসম্পূর্ণ ঈশ্বরপ্রীতি। ফলে বেশ কিছু উল্লেখ্য কাজ (বিশেষ বিবাহবিধি প্রবর্তন, সুলভ সাহিত্য প্রচার, সুরাপান বর্জন, লোকসেবা, নারীসমাজের উন্নতির প্রয়াস) সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজ ভ্রষ্ট হয়েছিল সমাজ-কল্যাণ তথা মানব-কল্যাণের উচ্চ আদর্শ থেকে। তদুপরি এঁদের খ্রিস্টভক্তির আতিশয্য হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের ভূমি প্রস্তুত করে দেয়।

এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ পুষ্ট করেছিল হিন্দু-ঐতিহ্য সম্বন্ধে গৌরববোধকে—এটাই আবদুল ওদুদের মত। তবে এক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়ের জাগ্রত বাঙালির শক্তিকে দমিত করার প্রয়াস, এক শ্রেণির শিক্ষিত বাঙালির বিমুখতা—এসবের দায়ও স্বীকার করেছেন ওদুদ।

১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাঙালি বিরূপ ছিল। বহু পণ্ডিত বলেন এর কারণ স্বার্থপরতা। ইংরেজ প্রসাদপুষ্ট তৎকালীন বাঙালি শাসকশ্রেণির বিমুখতার আশঙ্কায় সমর্থন করেনি ভারতের এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন সিপাহি বিদ্রোহ কালে বাঙালির সৃষ্টিক্ষমতা ছিল ব্যাপকভাবে সক্রিয়। এবং এরূপ ব্যাপ্ত সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে স্বার্থের যোগ থাকা সম্ভব নয়। তাঁর মতে ইংরেজ-শাসনের মাধ্যমে বাঙালি পরিচিত হয় ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার মনে উদ্রেক হয় শ্রদ্ধা এবং

মুগ্ধতা। ফলে পরাধীনতার গ্লানি বিস্মৃত হয়েছিল বাঙালি। একারণেই সে সিপাহি বিদ্রোহ সমর্থন করতে পারেনি।

সাধারণত বলা হয় বাংলার রেনেসাঁস ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক তথা নগরকেন্দ্রিক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজেই তা সীমিত ছিল। আর এই আলোকপ্রাপ্ত বাঙালিগণ সাধারণ শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। কাজী আবদুল ওদুদ এই মত পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি বলেননি যে সামগ্রিক মানস উৎকর্ষ রেনেসাঁস-এর প্রাণ তা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব সম্পর্কেও তিনি নীরব। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির দিকটি তাঁর নজর এড়ায়নি এবং তিনি এ সত্যও উপেক্ষা করেননি যে রেনেসাঁস-নায়কদের অনেকেই এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; কেউ কেউ তার প্রতিকারের চেষ্টাও করেছেন। রামমোহন ইংল্যান্ড-এ বাস কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত প্রজাদুর্গতি সম্পর্কে ব্রিটিশ-শাসককে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ভারতবাসী ইউরোপীয়দের প্রচলিত আইনের অধীন করার কথাও বলেছিলেন। কারণ প্রচলিত বিচারপদ্ধতির অধীন ছিল না বলেই নীলকর ইংরেজগণ নীলচাষিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে পেরেছিল।

১৮৫৮-৬০-এ যশোর, নদিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নীলচাষিদের মধ্যে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কলকাতার শিক্ষিত বাঙালিগণ এ বিদ্রোহে নীলচাষিদের পক্ষ সমর্থন করেন সক্রিয়ভাবে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব রামগোপাল ঘোষ নীলচাষিদের পক্ষ সমর্থন করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ('The Hindu Patriot') সহ বহু সংবাদপত্রে নীলকর অত্যাচারের বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হয়। দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন 'নীল দর্পণ' নাটক। এ নাটকে নীলকর অত্যাচারের সঙ্গে চাষিদের প্রতিরোধের দিকটিও চিত্রিত। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক রেভারেন্ড লঙের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনে নীলকরগণ। বাঙালি তাঁর পক্ষ সমর্থন করে।

কাজী আবদুল ওদুদ রেনেসাঁস সম্পর্কে বাংলার তথা ভারতের মুসলমান সমাজের উদাসীনতার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে শাসনক্ষমতার হস্তান্তর আর নিষ্কর বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে মুসলমানগণের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি হয়। পরিণামে তাদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি গ্রহণ করার বিরোধী মানসিকতা প্রবল হয়। পরে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর উন্নত অবস্থা আর সরকারি উচ্চ পদাধিকার—দৃষ্টে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো কোনো মনীষী স্বসম্প্রদায়কে ইংরেজি-শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রয়াস ছিল কেবলমাত্র চাকরিকেন্দ্রিক। ইংরেজি-শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা এবং মানসিকতার পরিবর্তন মুসলমানগণের মধ্যে দেখা দেয়নি। ওদুদের মতে এর কারণ দুটি—(১) মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ, প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল। জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথা থেকেও মুক্ত ছিল মুসলিম সমাজ। উপরন্তু তাদের মধ্যে ছিল ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামি। আরব থেকে আগত ওহাবি আন্দোলন তাকে পুষ্ট করেছিল। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা ছিল আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তনই মুসলমানদের দুর্গতি মুক্তির উপায়।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস যে সামগ্রিক চিৎ-প্রকর্ষ এবং তজ্জনিত পারস্পরিক কল্যাণবোধের বার্তা বহন করে এনেছিল তা বিপর্যস্ত হয়। তার বহু কারণ তিনি সযত্ন বিশ্লেষণে নিরূপণ করেছেন। তবে তাঁর প্রধান মত এই যে ইংরেজ সরকারের দমনমূলক আইনের প্রতিবাদকল্পে হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কিত গৌরববোধ জাত হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমবিস্তৃতিই এর কারণ।

ওদুদের মতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬)-এর আত্মসম্পূর্ণ ভগবৎ সাধনা, সন্ন্যাসপ্রীতি, গুরুপ্রীতি, অবতারবাদ প্রচার—এই পুনরুজ্জীবনবাদকে পুষ্ট করেছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) বিশ্বজয় এবং তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ এই মতবাদের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। যদিও বিবেকানন্দের মধ্যে মানবপ্রীতির দিকটি উপেক্ষিত হয়নি। বরং মানবসেবার উন্নত আদর্শে তিনি রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের তিনি প্রাণিত করেছিলেন। তথাপি তিনি সৃষ্টিধর্মী কাজে খুব বেশি মন দিতে পারেননি। কারণ এজন্য প্রয়োজন ছিল সংস্কারপন্থী হওয়া। বিবেকানন্দ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও তা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। ধর্মজীবনে শক্তি সঞ্চার করতে গিয়ে তিনি অর্থহীন বহু সংস্কারকেই শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদ নব জাগরণের অন্যতম দিক রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের দিকটিকেও উপেক্ষা করেননি। তাঁর মতে ব্ল্যাক অ্যাক্টস ও ইলবার্ট বিল সম্পর্কে ইউরোপীয়দের সফল সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ বাঙালিদের সংঘবদ্ধতার শক্তি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। এদিকে শাসকশক্তির মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র আইন, মফস্‌সলে কলেজ বন্ধ করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার প্রয়াস প্রভৃতিকে বাঙালিরা তাদের দমিত করার চেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে। তদুপরি আই. সি. এস. পদ থেকে সামান্য কারণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ ও আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স কমানো তাদের এই ধারণাকে পুষ্ট করে। ফলে শিক্ষিত বাঙালির আত্মপ্রকাশের প্রয়াস ১৮৭৬-এ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে রূপ পায়। ক্রমে জন্ম নেয় ভারতীয় কংগ্রেস। কিন্তু শীঘ্রই এই জাতীয়তাবোধ আপন উদার অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়। আবদুল ওদুদের এই মত যথার্থ যে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আইন বাঙালিদের মধ্যে যে প্রবল প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদ জাগিয়েছিল তা পূর্বে দেখা যায়নি। কিন্তু ক্রমে এ আন্দোলন বিদেশি দ্রব্য বয়কট-এর ক্ষেত্রে জবরদস্তি করার সূত্রে হিংস্র রূপ নিল এবং হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িক। স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হল। ক্রমে বাংলার জাতীয়তাবাদ সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড় নেয়। নেতৃবৃন্দ হয়ে ওঠেন দিশেহারা।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে এ সংকটময় পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ আপন অবুঝ হিন্দু-ঐতিহ্যমনস্কতা ত্যাগ করে গ্রহণ করেন প্রকৃত পথ নির্ধারণের কঠিন দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ বললেন বর্তমানে প্রয়োজন—কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা এবং ব্যাপ্ত মঙ্গল ইচ্ছার দ্বারা পরস্পরকে 'হৃদয়ের সহিত' গ্রহণ করা। পারস্পরিক অবজ্ঞা ও বিরোধ দূর করে নির্ভীক বিরাট বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়ার সাধনা করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতকে সমকালের দেশনেতাগণ স্বপ্নদর্শী কবির মত বলে উপেক্ষা করেন। সাধারণ মানুষও দীর্ঘ শ্রমসাধ্য গঠনমূলক মানব প্রীতিভিত্তিক কর্মধারার পরিবর্তে বয়কট, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি তাৎক্ষণিক ফলদায়ক চিন্তাধারার প্রতিই আকৃষ্ট হয়।

বাঙালির স্বদেশভাবনা তথা জাতীয়তার সাধনা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল একথা স্বীকার করেছেন ওদুদ। তাঁর মতে পরে গান্ধিজি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধর্মের অর্থ শাস্ত্রগ্রন্থ নয় চিরন্তন বিবেক—'Religion is eternal human conscience'—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং এভাবেই তিনি মানবতাবাদী উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের নেতাদের পথই অনুসরণ করেন। ওদুদ আরও মনে করেন গান্ধিজি অহিংসা, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করেন। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদের মতে গান্ধিজির অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের পথ বাঙালি তথা ভারতবাসী গ্রহণ করেনি। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আই. এন. এ.—দুটিই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রকাশ। এভাবেই উনিশ শতকে রেনেসাঁসজাত বাঙালির 'অপূর্ব-আত্মপ্রকাশ-চেষ্টা' সন্ত্রাসবাদের প্রবল টানে বিপর্যস্ত হল। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত রেনেসাঁস-এর মুখ্য ধারা জাতীয় জীবনে বিস্তৃত উন্নতির ধারা তথা জীবনবোধ ও রাজনীতির ধারায় বিপর্যয় এসেছিল।

কিন্তু আনুষঙ্গিক সাহিত্য ও শিল্পকলার ধারায় এসেছিল জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ এবং তজ্জনিত আনন্দ আর উৎসাহ। এই মনোভাবের সমুন্নত প্রকাশ লক্ষিত হয় মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। তবে ওদুদের মতে বাংলার সাহিত্যে পরে কিন্তু মহত্ত্বের তুলনায় রমণীয়তাই প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তিনি একই পরিণাম লক্ষ করেছেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালি যে প্রয়াস সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করেনি তাঁর এ কথাও যথার্থ। তিনি ঠিকই বলেছেন যে তুলনায় বিজ্ঞান-জ্ঞান সাধনায় বাঙালির অধিক সফল।

তাঁর মতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হলেও উদার মানবিকতার প্রকাশও ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের পরবর্তী তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এই মুক্ত বুদ্ধির প্রকাশই তিনি দেখতে পেয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বাংলার রেনেসাঁস বিপর্যস্ত হয়েছে কিন্তু বিফল হয়নি। কারণ যা জীবনের গভীর সত্য—ক্ষয়হীন কালজয়ী তার প্রকাশ। তবে 'সত্যাশ্রয়ীর আবির্ভাব হলেই সত্য আবির্ভূত হয়।' কাজেই দেশবাসীর পারস্পরিক উদার সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে একদা আবার সঞ্জীবিত হবে বাঙালি তথা ভারতবাসী। কারণ এটাই আধুনিক পৃথিবীর যথার্থ পন্থা।

কাজী আবদুল ওদুদের বাংলার রেনেসাঁস সম্বন্ধে গভীর চিন্তনজাত এইসব মতামতের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য।

## ২.৫ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল ওদুদ : গঠনশিল্প

প্রবন্ধের গঠন নানা ধরনের হয়। তবে মূলত প্রবন্ধকে অনুভবপ্রধান ও বিষয়প্রধান—দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যুক্তির প্রকৃষ্ট বন্ধনে বক্তব্যের তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণঋদ্ধ উপস্থাপনা উভয়তই প্রবন্ধের মূল লক্ষণ।

কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার রেনেশাঁস' শীর্ষক ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিষয়প্রধান প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে। যুক্তির শৃঙ্খলিত উপস্থাপনে বক্তব্য বিষয়ের প্রতিষ্ঠায় তিনি সফল। তথ্যবিপুলতা আর সম্যক বিশ্লেষণ—আলোচ্য প্রবন্ধটির বিশিষ্টতা।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্পষ্টতা এবং সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বিষয়মুখ্য প্রবন্ধের অন্যতম শর্ত।

কাজী আবদুল ওদুদ এ প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দুটি পৃষ্ঠায় তাঁর প্রতিপাদ্য যে বাংলার রেনেসাঁস—এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এসেছে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত ইউরোপের নব জাগরণের প্রসঙ্গ। কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁস-জাত সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সংস্পর্শেই বাংলায় দেখা দেয় রেনেসাঁস।

এরপরে তিনি কেন বাংলার রেনেসাঁসকে বিষয় করেছেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বাঙালি-মনে এই রেনেসাঁস সম্পর্কে দেখা দিয়েছিল উদাসীনতা। অতীত সম্পর্কে সচেতনতাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উৎস। আধুনিক বাংলার তথা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি-সাহিত্য-রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় আদর্শ—জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপান্তর এনেছিল যে বাংলার রেনেসাঁস—সে সম্বন্ধে সচেতনতাই এদেশের ভবিষ্যতের উন্নতির উৎস—এই বিশ্বাস থেকেই উঠে এসেছে আলোচ্য দীর্ঘ প্রবন্ধটি।

পরের অংশে যুক্তি ও তথ্য বিশ্লেষণ দ্বারা বাংলার রেনেসাঁস-এর যথার্থ সূচনা যে রামমোহন রায়ের কলকাতায় আগমন এবং 'বেদান্ত' গ্রন্থ প্রকাশ থেকে—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন ওদুদ। মাত্র দুটি পৃষ্ঠায় সংহতভাবে তিনি

বাংলার রেনেসাঁস-এর উৎস, তা নিয়ে আলোচনার কারণ এবং রেনেসাঁস-এর সূচনা সময়—এই তিন বিষয় উপস্থাপিত করেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ বাংলার রেনেসাঁস—এ বিষয়টিকে যুক্তি-তথ্যের যথাযথ বিন্যাস দ্বারা স্বচ্ছতা দিয়েছেন। তবে তিনি নিজস্ব একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন—বক্তব্যের কালানুক্রমিক বিন্যাস। রেনেসাঁস-এর সূচনা থেকে বিপর্যয়—প্রতি পর্যায়ে তিনি প্রধান চিন্তানায়ক এবং বিশিষ্ট বিষয়কে কালানুক্রমিকভাবে বিবৃত করার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ মূলত কলকাতায় রামমোহনের প্রয়াসে কেমন করে নব জাগরণের সূচনা হল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে রামমোহনের ইংল্যান্ড-এ প্রবাস এবং মৃত্যুর সংবাদে।

এই বিবৃতির মধ্যে রামমোহনের জীবনের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের মুক্তবুদ্ধির উৎসটি তিনি তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। সমকালের বাংলার সংস্কার-অন্ধকার দূর করার জন্য রামমোহনের প্রচেষ্টার বিবরণ যেমন ওদুদ দিয়েছেন; তেমনই বিশ্লেষণ করেছেন রামমোহনের আত্মমর্যাদাবোধ এবং অন্যের অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধে বোধ—এই নতুন মানসিকতা। বাংলা তথা কলকাতার সমাজে তখন দেখা দিয়েছিল হঠাৎ ধনী বাবুর দল। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দুর্গোৎসব প্রভৃতি চিরাগত অনুষ্ঠানকে তারা বিত্ত প্রকাশের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তার সঙ্গে ছিল ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা। রামমোহন প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে প্রচার করলেন একেশ্বরবাদ এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ধর্মের নামে সমাজে যা চলছে তা ভদ্র সমাজের অযোগ্য। রামমোহনের ইংরেজি-বাংলা রচনা থেকে প্রচুর এবং বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন ওদুদ। ফলে প্রবন্ধের আয়তন বেড়েছে—কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে রামমোহনের চিন্তার নবীনতা। পাঠক পরিচিত হয়েছেন রামমোহনের যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে। রামমোহনের প্রয়াসের বিরোধিতা যেমন হয়েছিল তেমন কিছু মানুষ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মত। তার প্রমাণও কাজী আবদুল ওদুদ দিয়েছেন সমকালের কিছু সংবাদপত্রের সংবাদ উদ্ধৃত করে। যেমন ১৮১৭ খিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' ('Calcutta Monthly Journal') থেকে তিনি শান্তিপুরের জনৈক খ্যাতনামা গোস্বামীর মৃত্যুকালে প্রকাশ্যে বেদান্তে বিশ্বাস ঘোষণা সংক্রান্ত সংবাদের অনুবাদ দিয়েছেন। ১৮৩১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার অদূরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে পাঁচশো লোকের একত্র ভোজন এবং বাইবেল, কোরান ও গীতা পাঠের সংবাদের কথাও তিনি বলেছেন।

সতীদাহ প্রথা রোধ, একেশ্বরবাদ প্রচার, পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে মতপ্রকাশ—রামমোহনের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের আনুষঙ্গিক উন্নতি সহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন ওদুদ; সঙ্গে আছে নিপুণ বিশ্লেষণ।

রামমোহনের মতবাদ যে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি যে পরবর্তী লিগ অবনেশনস বা ইউ. এন. ও.-র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন; আর রাষ্ট্রিক বাধা ছিন্ন করে বিশ্বমানবের মৈত্রীর কথা ভেবেছিলেন—এই সব তথ্যের গুরুত্ব তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দক্ষ বিশ্লেষণে স্বচ্ছ হয়ে গেছে এই সত্য যে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদমূলক অধ্যাত্মচেতনা, মধ্যযুগের আরব দেশের সুফিদের মানবপ্রীতির সাধনা আর আধুনিক ইউরোপের বস্তুনিষ্ঠ সাধনার সুষম অন্বয়ে রামমোহনের সাধনা হয়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট।

রামমোহনের সাধনা যে তুলনায় বাস্তবে রূপায়িত হয়নি তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি প্রমাণ করেছেন—সমকালের সমাজকাঠামো ও মানবচিন্তা রামমোহনের সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন ও ট্রাস্টডিড রচনা সত্ত্বেও এটি একটি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মসংগীত শ্রবণের কেন্দ্র মাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মানুষের পারস্পরিক প্রীতি ও হিত সাধনের কেন্দ্র হতে পারেনি এই প্রতিষ্ঠান।

রামমোহনের সাহিত্যসাধনার দিকটি কাজী আবদুল ওদুদ দৃষ্টান্ত দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন। বাংলা গদ্যকে রামমোহন যে স্ব-বশ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন এই সত্য উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায়।

প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের যোগ সাধন করা হয়েছে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থার বর্ণন-সূত্রে। এর সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে এর কারণ। সে কারণ এই যে, ব্যক্তি রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাসূত্রে সমকালের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মতবাদের তাৎপর্য তাঁদের বোধগম্য হয়নি। ফলে রামমোহনের অবর্তমানে ব্রাহ্ম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু নবজাগরণের ধারা থেমে গেল না। এবার এর নিয়ন্তা হলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক কবি দার্শনিক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো (Henry Vivian Derozio ১৮০৯-১৮৩১) এবং তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী। ওদুদ এ প্রসঙ্গে ডিরোজিয়োর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর সাহিত্যজীবনও মানসিকতার সুমিত পরিচয় দিয়েছেন। কীভাবে তিনি ছাত্রদের মানস-মুক্তির প্রয়াস করেছিলেন তারও বিশ্লেষণমুখ্য সংহত আলোচনা করেছেন ওদুদ। তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী বা ইয়ং বেঙ্গালদের যৌবনের নবোৎসাহে হিন্দু সমাজকে আক্রমণের দিকটি তিনি উপেক্ষা করেননি। সেই সময়ের সংবাদপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি বিষয়টিকে স্বচ্ছতা দিয়েছে।

ডিরোজিয়ো-র বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাঁর দেওয়া উত্তরও তিনি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তবে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক ‘গল্পজীবী’ ব্রাহ্মণের ডিরোজিয়ো-বিরোধী প্রচার যে ডিরোজিয়ো-বিতাড়নের প্রত্যক্ষ কারণ—তার সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি। এটিকে কিছুটা ত্রুটিই বলা যায়।

ইয়ং বেঙ্গালদের মধ্যে প্রধান নয় জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন ওদুদ। তাঁদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়েছে এই পরিচয়ে। বিশ্লেষণ করে ওদুদ দেখিয়েছেন যে ইয়ং বেঙ্গাল গণ তাঁদের উদার মানবিকতা, স্বদেশপ্রেম, সারল্য ও ন্যায়নিষ্ঠতায় হয়ে উঠেছিলেন রামমোহনের যথার্থ উত্তরসূরী। রামমোহনের অভিপ্রেত ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল মূল্যবান।

এখানে ওদুদ বাংলা সাহিত্যের নতুন রূপ গ্রহণের বিষয়টিও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন চিৎপ্রকর্ষের দিকটিকে। ইয়ং বেঙ্গালদের পরে নব জাগরণের ধারক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনসাধনায় নতুন শক্তি প্রাপ্ত ব্রাহ্ম সমাজ।

ওদুদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় দিয়েছেন; দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্ববিকাশের কথাচিত্র। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি বিষয়টিকে পাঠকের পক্ষে সহজগম্য করে তুলেছে। ওদুদ যুক্তি ও তথ্য সহায়ে প্রমাণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথই প্রথম ঘোষণা করেন শাস্ত্র নয় ধর্মের প্রকৃত আধার ‘আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ’ হৃদয়। এ প্রসঙ্গে লেখক রামমোহনের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণাও বিশ্লেষণ করেছেন।

এ অংশেই তত্ত্ববোধিনী সভা, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ক্ষুদ্র বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন ওদুদ। এঁদের প্রয়াসে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের দিকটিও তাঁর নজর এড়ায়নি। তবে প্রাধান্য পেয়ে বিদ্যাসাগরের সংস্কারক রূপটি।

এ সময়ের মধ্যে বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রসার এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন বিদ্যালয়ের কথাও এসেছে। তবে তা ততটা বিস্তৃত নয়।

এ অধ্যায়ে ওদুদ বলেছেন—এ সবই নব জাগরণের গঠনাত্মক দিক। কিন্তু এর সঙ্গে দেশে ‘ভাণ্ডার’ দিকটি বড়ো হয়ে দেখা দেয় মুসলমান সম্প্রদায় আর চাষিদের মধ্যে। তা ছাড়া লেখক এ অংশে নীল বিদ্রোহ, ব্ল্যাক অ্যাক্টস, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন আর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম-হিন্দুদের সাময়িক ঐক্যের উল্লেখও করেছেন।